ইতিহাসে চাঁদপুর
(১ম পর্ব)
প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

প্রকাশকঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ
রিয়াদ, সউদী আরব।

প্রকাশকালঃ ইন্টারনেট সংস্করণ
ডিসেম্বর ১২, ২০০৫ইং
সংশোধিত ২য় প্রকাশঃ জুন২০০৬ইং
আষাঢ ১৪১৩ বাঙলা।

গ্রন্থ স্বত্বঃ লেখক
প্রচ্ছদে চাঁদপুর জেলার মানচিত্র

কম্পিউটারে বাঙলা কম্পোজঃ
আসিফ ইসলাম
লুবনা বাসেত বৃষ্টি
জেকরা বাসেত নদী
(বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চাঁদপুর জেলার প্রবাসী ভাইবোনদের জন্যেই আমাদের এই আয়োজন।)

সকল যোগাযোগঃ
Email: marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
website : www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur

প্রকাশকের কিছু কথা

মরুপলাশ স্বনামে ইন্টারনেটে যাত্রা শুরু করেছিলো গত ডিসেম্বর ২০০৪ইং এ। চলতি বছরের ডিসেম্বর ২০০৫ এ এসে ইহার এক বছর পূর্ণ হলো। এই চলার পথে আমরা পেয়েছি অনেক স্বজন-সুধীজনকে। যাঁদের প্রেরণা আমাদের প্রাণশক্তি যুগিয়েছে। বানিয়েছে সাহসী। বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের আত্মবিশ্বাস। আমাদের একটি বদনাম আছে যে, আমরা ইতিহাস বিমুখ জাতি। এমন কথা স্বীকার করতে আমার কষ্ট হয়। কেন না 'দ্বিমাসিক ***রূপসী চাঁদপুর***' এ আমরা যখন চাঁদপুর জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করি। তখন শত শত প্রবাসী পাঠকগন চাঁদপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাদের ই-মেইল করেছেন। যেহেতু আমরা চাঁদপুরের। তাই আমাদেরই পবিত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্য চাঁদপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে চর্চা করা, লেখা, গবেষণা করা এবং তা পুরো বিশ্বে সগৌরবে তুলে ধরা।

এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমি চাঁদপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। বেরিয়ে আসেন মরুপলাশকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতার জন্য একজন। হাত বাড়িয়ে দিলেন টগবগে তরুণ কম্পিউটার প্রোগ্রামার, চাঁদপুরের '***মাই কম্পিউটার***' প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী জনাব আসিফ ইসলাম। চাঁদপুরের ইতিহাস নিজে জানা এবং অন্যকে জানানোর তাগিদ অনুভব করেই আসিফ ইসলাম খুঁজে বের করেন আর এক চাঁদপুরের রত্ন প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে। যিনি এই গ্রন্থখানি আমাদের ***মরুপলাশ*** এবং ***রূপসী চাঁদপুর*** এর জন্য লিখেছেন। লেখক জানিয়েছেন এ গ্রন্থে মোগল থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসনের শেষ সময় মানে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত লিখেছেন। ***ইতিহাসে চাঁদপুর*** ইহা হচ্ছে প্রথম পর্ব। ***ইতিহাসে চাঁদপুর*** দ্বিতীয় পর্ব হবে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত। উল্লেখ্য লেখক নিজে বইটির নাম দিয়েছিলেন **'ইতিহাসের বাঁক বদলে চাঁদপুর নামের জনপদ'** আমরা এই নামের পরিবর্তন করে 'ইতিহাসে চাঁদপুর' নাম দিই। ইহার দ্বিতীয় পর্ব শেষ হলেই আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছে রাখি। ইতিহাস লেখা একটি কষ্টসাধ্য কাজ। এমন বিশাল শ্রমের জন্য আমরা মরুপলাশ এর পক্ষ হতে লেখক প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওনার ইতিহাস মনস্কতা, মেধা-মননকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

সবার মঙ্গল কামনায়-

দেওয়ান আবদুল বাসেত

সম্পাদক, মরুপলাশ, রূপসী চাঁদপুর, মোহনা

রিয়াদ, সউদী আরব।

Our special thanks to Mr. Asif Islam.....

মরুপলাশ এবং ***রূপসী চাঁদপুর*** এর প্রতিনিধি আসিফ ইসলামকে জানাই অন্তবিহীন ধন্যবাদ যিনি এই বিশাল গ্রন্থখানি বাংলায় কম্পোজ করে ই-মেইলে আমাদের পাঠিয়েছেন।

*বাংলাদেশে **মরুপলাশ** এবং **রূপসী চাঁদপুর** এর নিজস্ব প্রতিনিধি আসিফ ইসলাম*

ইতিহাসে চাঁদপুর

ভূমিকা ঃ

মানব জাতির ইতিহাসটি কতদিনের বা কত যুগের তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের সীমা নেই। কবে, কখন, কোন মহেন্দ্রক্ষণে জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল, পৃথিবীর কোন প্রান্তে জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল তা নিয়েও চলছে নানা গবেষণা। যেমন গবেষণা চলছে মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিগব্যাং থিওরিটি মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই থিওরির সব কিছু যে ধ্রুব সত্য তাও নয়। স্টিফেনহকিন্সসহ যে সব বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম থিওরি, আপেক্ষিক চুম্বক ক্ষেত্র এবং বিশ্বভূবনের উৎপত্তি নিয়ে কাজ করছেন তাদের ধারণা কোন এক সময় মহাবিশ্বের সঙ্কোচনের পর যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তাতেই সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বব্রহ্মান্ড। এরপর মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে এবং স্থানে স্থানে সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন নক্ষত্র আর সেই সঙ্গে কোন কোন তারা নিজস্ব গতিতে সঙ্কুচিত হয়ে তৈরি করছে কৃষ্ণবিবর বা **BLACK HOLE**। এতো গেলো পৃথিবীর কথা। আমাদের চাঁদপুর কখন থেকে যাত্রা শুরু করলো, সে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করবো বলেই, এবারের লেখাটি চাঁদপুর নামে জনপদ। ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে হাজার বছর অতিক্রম করতে পারিনি আমি। এই হাজার বছররের প্রায় পুরো সময়টা জুড়েই এই অঞ্চলের ইতিহাস আর জনগোষ্ঠীকে ইসলামের সাথে জড়িত। বাংলায় সাড়ে সাতশত বছর মুসলিম শাসন, দুইশত বছর ইংরেজ শাসন আর সাতান্ন বছর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসন। এই হাজার বছর। এক সহস্র বছরে ইতিহাস তার বাঁক বদল করেছে বেশ কয়েকবার। আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

এই হাজার বছর শাসন কালে, বিভিন্ন রাজন্যবর্গ তাদের কীর্তি সমূহ অনেক ইট সুরকির অবকাঠামোতে উৎকীর্ণ করে গেছেন। কিছু কিছু ইমারতের গায়ে শিলালিপি আছে কোনটি শিলালিপিহীন সেই অবিস্মরণীয় সম্পদগুলোর পরিচয় আমরা ইতিহাসের বন্দী বুক থেকে উদ্ধার করে আনার চেষ্টা করেছি, কিছু কিছু উদ্ধার করতে পারিনি। প্রকৃত ইতিহাস জানার জন্যে শিলালিপির শব্দগুলোর অর্থ আমাদের জানতে হবে। তা না হলে অন্ধকার অতীত ভবিষ্যতকে কোন প্রকার আলো সরবরাহ করতে পারবে না। তাই যত বেশি পারা যায় আমাদের সমাজকে, আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে অতীতের সব সোনালি দৃষ্টান্তের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের সত্তার সাথে পরিচিত হয়ে উঠবে। আমরা দেখেছি চাঁদপুর অঞ্চলের চারটি পরগনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে হাজার বছরের এক সমৃদ্ধ তথ্য বহুল অতীত কথা বলতে শুরু করে। সেটাই আমাদের ইতিহাস একথা মনে রেখে আমরা অগ্রসর হয়েছি। বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে অনেক সুজন আমাদের সাথী হয়েছেন। তাদের কথা আলোচনায় উঠে এসেছে।

আরো একটি কথা অবশ্যই আমরা স্মরণ রেখেছি যে জাতির ইতিহাস নেই সে জাতির ভিত্তি বড়ই দুর্বল। আর যে জাতির ইতিহাস আছে, সে সাময়িকভাবে কোন চক্রান্তের শিকারে পতিত হলেও যেহেতু, তার ভিত্তি মজবুত তাই তার অবিস্মরণীয় অতীত ইতিহাসের উজ্জ্বল ঐতিহ্যই একদিন তাকে সেই আবর্ত থেকে

উঠে আসতে সাহায্য করবে। পৃথিবীর মানচিত্রের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাসের গতিধারা থেকেই আমরা তার শিক্ষা পাই। এই প্রবন্ধে আমরা চাঁদপুর জেলার হাজার বছরের ইতিহাসে অতীত তুলে ধরার চেষ্টা করবো অবশ্যই। ঘটে যাওয়া অতীতের বর্ণনায় আমরা সৎ ও নিরপেক্ষ থাকবো। এই অতীতের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলার ইতিহাসে মুসলিম শাসন অনুসঙ্গের বিন্দু বিসর্গ। বর্তমান বাংলাদেশ এই মুসলিম শাসনের সাড়ে সাতশত বছরেই গড়ে ওঠেছে। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি কৃষ্টি বাংলার মুসলিম শাসকদেরই সৃষ্টি।

আজ আমাদের উৎস, উৎপত্তি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আর্দশের নামে আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের সামনে যা তুলে ধরা হচ্ছে সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ইতিহাসের আলোকে, আমাদের অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সেগুলো পরীক্ষা নিরিক্ষা করে বর্তমানের সাথে নিজেদের অতীতের গরমিল গুলো সংশোধন করে নিতে হবে। সেই সব গরমিল দুর করে একটা পরিচ্ছন্ন কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আদর্শের সাথে আমাদের জনগনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সে কর্তব্য ও দায়িত্বে আমরা যদি সচেতন থাকি তাহলে আমাদের সমাজ অবশ্যই বিভ্রান্তির কবলে পড়বে না- পড়তে পারে না। আর সেই কারণেই আমাদের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। আমরা অতীতের সত্যিকার ও স্বচ্ছ একটা ছবি উদ্ধার করার চেষ্টা করবো। সেটা অবশ্যই ইতিহাসের শরীর বেয়ে অগ্রসর হবে। আমাদের সম্মুখে ভাস্বর হয়ে ওঠবে হাজার বছরের অতীত, কিছু সোনালী অধ্যায় আমাদের প্রেরণা যোগাবে। সুধী পাঠক, আমাদের মনে রাখা দরখার বিগত দুশতাব্দির শোষণ শাসনে কোন ঐতিহ্য নেই। আছে কিছু কলংক। শোষণ, বঞ্চনার শেষ দু'শতাব্দীর আলোচনা থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করবো।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুনের পর, বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত যে কোন স্থাপন যে গুলো ইংরেজদের তাবেদার শ্রেণী তৈরী করে ছিলো সেগুলো বাঙালীর ইতিহাসে কলঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাংলা, বাঙ্গালীর ইতিহাসে দুই দুষ্টক্ষত জমিদার আর নীলকর এদের ইতিহাস শুধু দুঃখই বাড়ায়, উজ্জিবীত করে না।

প্রথমে একটা প্রশ্ন ওঠে, ইতিহাস আমরা কেন পড়ি। বর্তমানে বসে নিজেকে চিনতে ও জানতে গেলে নিজের অতীতের পরিচয় ছাড়া ঠিকমত চেনা ও জানা হয় না। আর নিজেকে ঠিকমত না চিনে ও না জেনে ভবিষ্যতের কর্মসূচী প্রণয়ন করতে গেলে সে কর্মসূচী সুষ্ঠু ও যথাযথ না হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া আমরা আমাদের বংশধরদের দিকে তাকিয়েই ভবিষ্যত কর্মসূচী প্রণয়ন করি। কেননা, আমরা চাই যে, আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা যেন বিভ্রান্ত না হয়- যেন বিপথে পরিচালিত না হয়, তারা যেন তাদের নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বলীয়ান হয়েই যুগের কাফেলায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পারে। বিজাতীয় সংস্কৃতি নিজেদের নয় একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আসুন আমরা জেনে নেই আমাদের প্রিয় জেলার নাম কেমন করে চাঁদপুর হলো। নাম করণের পেছনে কোন ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

জনপদের নামকরণ ঃ চাঁদপুর

চাঁদপুর নামকরনের বয়স যদিও সাতশত বছরের বেশি নয়, তবুও ইতিহাস প্রমাণ করে এই লোকালয় হাজার বছরের পুরানো। ইতিহাসখ্যত পাঠান সম্রাট শের শাহ যখন খাজনা আদায়ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার মানসে তার সাম্রাজ্যকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরাগনায় বিভক্ত করেন তখন আজকের চাঁদপুর জেলার সমগ্র অঞ্চলে পাঁচটি পরগনার অস্তিত্ব ছিলো। পাঁচটি পরগনায় পাঁচজন পরগনা অধিপতি ছিলেন ফৌজদার , কতোয়াল, তহসীলদার, দেওয়ান নামক পদবীর কর্মকর্তাবৃন্দ এই পরগনা সমূহে কর্মরতছিলেন। অনেক কর্মকর্তার ইতিহাসের সাথে রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। আমরা ইতিহাসের আলোকে অবগাহন করে নিজেদের আসল চেহারা যা বর্তমানে কুটিল চক্রান্তের বেড়াজালে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবো। প্রাপ্তির অনুভূতি থেকে আমাদের মনে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠবে অভিনব এক চেতনা। সে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেখা দেবে এক নব দিগন্তের দ্বারোদ্ঘাটন। সুধী পাঠক, আমাদের একথা ভুললে চলবে না ১৭৫৭ সালের যুদ্ধ নামক প্রহসনে পরাজয়ের পর থেকে ১৯৪৭ এর পূর্ব পর্যন্ত ১৯০ বৎসর সময় আমাদের ঐতিহ্য নয়, কলঙ্ক। সাগর পাড়ের দস্যু, বেনিয়া ইংরেজদের শাসন-শোষণ ও তাদের এদেশিয় তাবেদার নব্য ধনিক শ্রেণী, তথা কথিত জমিদারদের অত্যাচার অবিচার এই দুইটি শতকে জাতির ললাটে শুধুই কলিমা লেপন করেছে। কলঙ্কের এই সময়টুকু আমরা প্রবন্ধে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাবো, তারপরও হাজার বছরের অতীতকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো এবং এটুকুই আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্বটুকুই যদি আমরা আন্তরিকতার সাথে পালন করি তা হলে বর্তমান যুগের কুহেলি অতিক্রম করে আমাদের সমাজ অচিরেই স্বাধীন জাতির ইস্পিত লক্ষ্যে পৌছাঁতে পারবে। এই ভূখন্ডে ইসলামের ইতিহাস আমাদের অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা, কৃষ্টি ও জাতিসত্তার গঠনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ত্রেতা যুগে আর্য সমাজের প্রতিনিধি রাম হয়েছেন ইশ্বর, দ্রাবিড় সমাজের প্রতিনিধি রাবন হয়েছেন রাক্ষস। দ্রাবিড় আর্যের জাতিগত মেটাতে ভারত ভুমিতে এসেছে ইসলাম ভারতে সুপ্রাচীন সঙ্গীত, নৃত্য কলা ইসলামের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে মিশে এক অপূর্ব মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম নিয়েছে। যার কোন তুলনা সারা বিশ্বে নেই। আমরা বাঙালীরা সেই সুমহান সংস্কৃতির সার্থক উত্তরসূরী।

একটি জাতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। পৃথিবীর কোন্ পর্যায়ে মানুষ দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি আজও সে তথ্যের সীমান্ত স্পর্শ করতে পারেনি। কতো হাজার, লক্ষ বা কোটি বছর আগে মানুষের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছিল সে ইতিহাস আজও তমসাচ্ছন্ন। এমনকি প্রাচীন গ্রন্থাবলী, মৃত্তিকাগর্ভ থেকে উদ্ধারকৃত সভ্যতার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে মানবেতিহাসের সে সব মুছে যাওয়া পাতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাও মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির মাত্র আট থেকে দশ হাজার বছর বয়ঃক্রমের নির্দেশক। আমাদের চাঁদপুর জেলার আটটি উপজেলা ঘুরে, হাজার বছরের প্রাচীন কোন প্রত্নত্ত্বাতিক নির্দশন খুজে পাওয়া যায়নি। যদিও আট-দশ হাজার বছরের মধ্যে মিসর, ব্যাবিলন ও নিনাভের সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটেছে। গ্রীক, রোম, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছে ও পরবর্তীকালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। প্রাচীনকালের সেই

ইতিহাসের ছিটেফোঁটা সভ্যতার জাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। সেই রক্ষিত ইতিহাসের কতটুকু প্রামাণ্য আর কতটুকু প্রামাণ্য নয় তাও এক বিচার্য বিষয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সভ্যতার উত্থান ও লালনের এক বিশেষ ও প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে ভূমধ্য ও লোহিত সাগরীয় অঞ্চলকে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা এ অঞ্চল থেকেই মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। দ্রাবিড় আর্য বা মঙ্গোলীয় সভ্যতার বিশেষ কোন শ্রেণী আমাদের পূর্ব পুরুষ হিসেবে একভাবে চিহ্নিত নয়। আমরা একক ভাবে কোন নৃগোষ্ঠীর অধ্বস্তন প্রজন্ম নেই। জমাট বাধা কোন জাতি সত্তার অংশ হিসেবে বাঙালীর উন্মেষ হাজার বছরের প্রাচীন নয়। কুমিল্লা অঞ্চলটি নদী মাতৃক না হওয়ার কারলে এখানে বহু পূর্ব থেকেই নগর সভ্যতার সূচনা হয়েছিলো, ফলে এখানে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বাঙালীকে খুঁজে পাওয়া যায় না বর্তমানে বিভিন্ন সত্তার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা বাঙালী নামক সতন্ত্র জাতিসত্তা ও বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বেড়ে ওঠার সময় হাজার বছরের বেশি নয়। বাঙালী হওয়ার আগে আমাদের অন্য পরিচয় ছিলো যা আজ কালের অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে গেছে। আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, ঋগ্বেদের আমলে আজকের বাঙলাদেশের অধিকাংশ ছিল সমুদ্র মাঝে মাঝে জেগে ওঠা দ্বীপে ধীবর শ্রেণীর কিছু মানব গোষ্ঠীর বসবাস ছিলো। আরো অনেক পরে শুক্লাযর্জুবেদের যুগেও গন্ডকী নদীর পূর্বদিক ছিল জলপ্লাবিত। মহাভারতিক কালেও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ ছিল সমুদ্রে লীন। পর্যটক স্ট্রাবোর ভারত ভ্রমণ কালে (১৮-২৪ খ্রী) সমুদ্রের লোনাজল প্রতিরোধের জন্য বহু নগরের চারদিকে বাঁধ ছিল। হিউএয়নৎসাঙও সমতট এবং কামরূপের মধ্যাঞ্চলে প্রায় হাজার ক্রোশব্যাপী হ্রদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এইসব ঐতিহাসিক বক্তব্য সমূহ বিশ্লেষণ করলে একটি সত্য বের হয়ে আসে হাজার বছর আগে আমাদের চাঁদপুর অঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকা সমুদ্রের নিচে তলিয়ে ছিলো। লালমাই পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে যেতো মেঘনা নদীর একটি স্রোতধারা বা শাখা নদী। কালের বিবর্তনে, ভূ প্রাকৃতিক কারণে নদীর সে স্রোত ধারাটি ভরাট হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। চন্ডিমুড়া পাহাড়ে ওপর শিব ও কালীর দু'টি প্রাচীন মন্দির রয়েছে, ওখানে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনা করলে পাহাড়ের পাদদেশে বহমান একটি বড় নদীর কথা পাওয়া যায়।

তবু বাঙলা ও কামরুপে যে মহাভারতিক যুগে বসতিবহুল ছিল তা নিশ্চিত। পুন্ডের বসুদেব, ভগদত্তের প্রাগজ্যোতিষপুর (আসাম) ঐ যুগের আর্যদের অজ্ঞাত ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (খ্রী. পূ. ৭ম শতক) পুন্ড্রের জনগণকে দস্যু বলা হয়েছে। এতে অন্তত একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে খ্রীষ্টপূর্ব সাত শতকেও এদেশে জনবসতি ছিল এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আর্যসমাজে আহৃত হয়েছে। অনেক ইতিহাসবিদ বাংলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চলের সাথে একত্রিত করে ফেলেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিলো দ্বীপের মতো, চারদিক জল বেষ্টিত ছিলো। সম্পূর্ণ ভূখন্ডের সমুদ্র থেকে জেগে ওঠার বয়স হাজার বছরের বেশি নয়। চাঁদপুরের উত্তর পূর্বাঞ্চল হাজিগঞ্জ, কচুয়া, শাহরাস্তি অন্য অঞ্চল গুলোর চেয়ে প্রাচীন। বৃটিশ শাসন আমলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস রেনেল তৎকালীণ বাংলাদেশের যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামে এক অখ্যাত এক জনপদ ছিলো নরসিংহপুরের কাছাকাছি কোন এলাকায় বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে সমৃদ্ধ একটি প্রশাসনিক দপ্তর ছিলো। তখন চাঁদপুরের দক্ষিণে অবস্থিত নরসিংহপুরে (বর্তমানে নদী গর্ভে বিলীন) চাঁদপুরের ইংরেজ স্থাপিত অফিস আদালত ছিলো। পদ্মা-মেঘনার সংগমস্থল তখন ছিল বর্তমান স্থান হতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে। ধীরে ধীরে নদী এ এলাকাকে গ্রাস করে।

১৭৭৯ সালে মেজর জেমস রেনেল মানচিত্রে ত্রিপুরা জেলার সাথে নরসিংহপুরের কাছে চাঁদপুরের অবস্থান সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। চাঁদপুরের নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বার ভূঁইয়াদের আমলে চাঁদপুর অঞ্চল বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায়ের দখলে ছিল। এই

অঞ্চলে তিনি একটি শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, যা বর্তমানে বিলুপ্ত এটি নরসিংহপুরের কাছাকাছি ছিলো। ঐতিহাসিক জে. এম. সেনগুপ্তের মতে চাঁদরায়ের নাম অনুসারেই এ অঞ্চলের নাম হয় চাঁদপুর যদিও এর সমর্থনে ইতিহাসে জোরালো কোন প্রমাণ নেই। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার (বর্তমান কুমিল্লা) অংশ বিশেষ নিয়ে চাঁদপুর মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৯৭ সালে চাঁদপুর পৌরসভা গঠিত হয়। মহকুমা গঠিত হওয়ার একশত বৎসর পূর্বে মেজর রেনেল চাঁদপুর নামে জনপদকে তার অঙ্কিত মানচিত্রে ঠাঁই দিয়েছেন। মানচিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে চাঁদপুরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বন্দর আর যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মহকুমার প্রান্ত সীমা হওয়া সত্ত্বেও এখানে নতুন মহকুমার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। চাঁদপুর সহ সংলগ্ন অঞ্চলের পাট রফতানী করার জন্যে লন্ডনঘাট নামে একটি বন্দর স্থাপিত হয়েছিলো। এই বন্দর থেকে বাংলার পাট লন্ডনে রফতানী করা হতো।

চাঁদপুর নামকরণে সব চাইতে শক্তিশালী মতটি একজন আওলিয়ার স্মৃতির সাথে জড়িত অনেক ঐতেহাসিকের মতে শাহ চাঁদ আউলিয়ার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে নতুন জনপদের নামকরণ করা হয় চাঁদপুর নামে। শাহ্ চাঁদ আউলিয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহির-উদ-দীন বাবরের বহু পূর্বে পূর্ববঙ্গে আসেন। ১৩০৩ সালের সিলেট যুদ্ধের পর এ অঞ্চলে আসেন (১৩৩৮-১৩৪৮) এবং কিছুদিন অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেন। শাহ্ চাঁদ আউলিয়া তিনি বিভিন্ন স্থানে সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। বিভিন্ন সময়ে সুবে বাংলার নানাহ স্থানে অবস্থান করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ও খোদাভক্ত একজন মুসলিম প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন। সংসার বিরাগী ধার্মিক ও অকৃতদার হওয়ার কারণে, শাহ চাঁদ আউলিয়ার পিছুটান ছিলো না। মানব সেবায় তিনি নিজেকে সম্পুর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তার সর্বশেষ কর্মস্থল পটিয়া। পটিয়া থানার এক মাইলের মধ্যে শ্রীমতী নদীর তীরে শাহ চাঁদ আউলিয়ার মাযার অবস্থিত। পটিয়া থানার মুসলমান -হিন্দু নির্বিশেষে সবাই তাঁর প্রতি সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। তিনি যখন চাঁদপুর অঞ্চলে আসেন, তখন বাংলার শাসক ছিলেন সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-৪৮)। বৃহৎ ফরিদপুর খুলনা, বরিশাল ও যশোহর ও আসাম অঞ্চলে সৈন্য চলাচল ও অভ্যন্তরিন বানিজ্যের জন্যে চাঁদপুর অঞ্চলে সমৃদ্ধ নদী বন্দর গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নদী বন্দরের অবস্থান বর্তমান চাঁদপুর থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কোনে অবস্থিত ছিলো বলে জানা যায়। পরবর্থী সময়ে বাংলার আফগান ও মোগল উভয় শাসক গোষ্ঠিই চাঁদপুর বন্দরকে গুরুত্ব দিতো। শাহ চাঁদ আউলিয়া এবটি কার্যক্ষম নদী বন্দর গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রচুর শ্রম মেধা ব্যায় করেছিলেন, ফলশ্রুতি স্বরূপ চাঁদপুর জনপদের নাম শাহ্ চাঁদ আউলিয়া নামেই হয়েছিলো।

কথিত আছে, চিরকুমার শাহ্ চাঁদ আউলিয়া দিল্লীতে আত্মগোপন করে বাস করতেন। দিল্লীর জনৈক শাহাজাদী মনের মত স্বামী সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তাঁর কাছে ভাগ্য গণনা করার জন্যে যান। তিনি শাহাজাদীকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর স্বামীভাগ্য নেই। এতে শাহাজাদী ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বিয়ে করার জন্য শাহ চাঁদকে চাপ দিতে থাকেন। শাহাজাদীর ভয়ে *সংসার বিবাগী শাহচাঁদ দিল্লি ত্যাগ করে বাংলার সর্বপুর্ব প্রান্তে চলে আসেন এবং সরকারি চাকুরী গ্রহণ করেন। চাকুরী উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পর সরকারি চাকুরী ত্যাগ করে তিনি চট্টগ্রামের পটিয়ায় স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়েন। ইতিপুর্বে তিনি যেসব স্থানে অবস্থান করেছিলেন সে স্থানগুলো তাঁর নামে পরিচিত হয়। যেমন মেঘনা পারের চাঁদপুর বন্দর, সীতাকুন্ডের চাঁদপুর, চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী চাঁদগাঁও এবং পটিয়ার চাঁদখালী।* এ সব স্থানের নামকরণ থেকে শাহ চাঁদ আউলিয়ার জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। তিনি যেখানে অবস্থান করতেন সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন। পূর্ব বঙ্গে তার আগমন ঘটে চৌদ্দ শতকের প্রথম ভাগে। তখন ভারত বর্ষে নতুন রাজশক্তি হিসেবে আফগানদের আবির্ভাব ঘটে। সে হিসেবে চাঁদপুর অঞ্চলটি সাতশত বছরের প্রাচীন একথা প্রমানিত হয়। প্রায় ষাট বছর পূর্বে নরসিংহপুর এলাকার যে প্রাচীন মসজিদটি মেঘনার ভয়াবহ ভাঙ্গনে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সেটি সম্ভবত শাহ্ চাঁদ আউলিয়ার

সময়ের। তোঘলক সম্রাট মুহাম্ম বিন তোঘলক সে সময়ে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। স্বাধীন শাসকবৃন্দ ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এইসব শাসকদের সমতট অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার কালে চাঁদপুর বন্দর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শোনা যায়, শাহ চাঁদের কিছুদিন পর দিল্লীর শাহাজাদীও তাঁর অনুন্ধানে লোকজনসহ বাংলায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু ঘটনাক্রমে শাহাজাদীর আগমনের কিছুদিন পরেই শাহ চাঁদ আউলিয়ার মৃত্যু হয়। শাহাজাদী তাঁর ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অতঃপর মাযারের খাদিমরূপে জীবন-যাপন করতে থাকেন। বর্তমান পপটিয়া থানার এক মাইলের মধ্যে শ্রীমতি নদীর তীরে হজরত শাহচাঁদ আউলিয়ার মাযার অবস্থিত। হযরত শাহজালালের সাথী হয়ে দিল্লী থেকে ১২৯৫ থেকে ১৩০১ খ্রিঃ সালের মধ্যে হজরত শাহ চাঁদ আউলিয়া পূর্ববঙ্গ আসেন বলে কোন কোন ঐতেহাসিক ধারনা করেন। জনশ্রুতি অনুসারে হযরত শাহ চাঁদ আউলিয়ার প্রায় সাতশত বছর পুর্বে পূর্ববঙ্গে আগমনের ঘটনাটির ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। বর্ণিত এ কথা সত্য হলে বলা যায়, শাহ চাঁদ আউলিয়া চৌদ্দশতকে জীবিত ছিলেন এবং চাঁদপুর নামক লোকালয় গুলোর বয়স কমপক্ষে সাতশত বছর। সুলতান ফখরু-উদ-দীন মুবারক শাহ্ চট্টগ্রাম থেকে নরসিংহপুর অর্থাৎ মেঘনা পাড়ের একটি সমৃদ্ধ জনপদ পর্যন্ত বাধ নির্মাণ করে ছিলেন সময়কাল (১৩৩৮-১৩৪৮) যা পরবর্তী সময়ে সুলতান গিয়াস পুনঃ নির্মাণ করেছিলেন (১৪১৩-১৫১৯)।

সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নির্মিত বাঁধের পশ্চিম প্রান্তেই ছিলো চাঁদপুরের প্রাচীন নৌবন্দরটির অবস্থান। ইতিহাস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে সতশত বছর পূর্বেও এই নৌবন্দর সচল ছিলো। ১৪৭৫ এবং ১৫০৫ সনে ভারত বর্ষে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছিলো। এই ভূকম্পনে আগ্রা শহর সম্পূর্ণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়ে ছিলো গঙ্গা, যমুনা তাদের গতি পথ পরিবর্তন করেছিলো।

যমুনা নদীর সাথে সংযুক্ত অনেক বড় বড় নদীর গতিপথ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। বাংলার ভূ প্রাকৃতিক মানচিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। অনেক ঐতিহাসিক কীর্তি মাটি চাপা পড়ে যায়। সেই ঐতিহাসিক স্থাপনার কিছু কিছু পুনরোদ্ধার থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়। আমাদের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং গৌরবদীপ্ত অতীত। সাম্য, ন্যায়বিচার, মানবতাবোধ, মুল্যবোধ, সাহস, বীরত্ব, মহত্ত্ব ও উদারতার ভিত্তিতে রচিত সেই গৌরবময় ইতিহাসই আমাদের আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পেছনে যেমন ভূমিকা রেখেছে, তেমনি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও তাতে রয়েছে অফুরন্ত জীবনদায়ী রসদ-যা আমাদেরকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে পারে। অন্যদিকে ভৌগোলিক পরিচিতির বাইরে আমাদের রয়েছে আরেকটি স্বতন্ত্র আদর্শিক পরিচিতি- মহান ইসলামের আলোকে যার পরিপুষ্টি। আমাদের এই স্বতন্ত্র পরিচিতি বা জাতিসত্তা বিনির্মাণের ইতিহাস সব সময়ই ছিল গৌরবজনক। অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে তা বর্তমানের চাইতেও অধিকতর শ্রেয়। সুতরাং বারবারই আমাদেরকে গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। বাংলার সাথে চাঁদপুরের ইতিহাস অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। প্রবন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পন হয়, যার ফলে আগ্রানগরী সম্পূর্ণ ধ্বংশ হয়ে যায়, এর আগে খৃষ্টীয় চর্তুদশতকের শেষ ভাগে বাংলাদেশও অনুরূপ ভূমি কম্পন হয়। ভূমি কম্পনের ফলে ত্রয়োদশ ও চর্তুদশ শতকের অনেক স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংশ হয়ে যায় অথবা মাটি চাপা পড়ে যায়।

স্বাধীন সুলতানগণের আমল ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ ঃ

প্রাক মোগল মসুলিম স্বাধীন সুলতানগণ বাংলায় প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করেন। তাঁরা দিল্লীর কোন প্রকার অধীনতা স্বীকার করতেন না। তাঁরা নিজেদের নামে মুদ্রা তৈরি করতেন ও খুতবা পড়াতেন। এ আমলে বাংলার সম্পদ বাংলায়ই থেকে যেতো, দিল্লীতে বা অন্যত্র পাঠানো হতো না। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ছিলেন এ ধরনের প্রথম স্বাধীন সুলতান। সুলতান বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তিনি সোনারগাঁও অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। ফলে লাখনৌতি ও সাতগাঁও এর শাসনকর্তাদ্বয়ের একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। ফখরুদ্দিন পরাজিত হন। কিন্তু বিজয়ী শাসনকর্তাদ্বয় ও তাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরোধের সুযোগে ফখরুদ্দীন পুনর্বার সোনারগাঁও দখল করতে সক্ষম হন। লাখনৌতির শাসনকর্তা কদল খান নিহত হন। ফলে ফখরুদ্দীন লাখনৌতিও সাময়িকভাবে দখল করতে সক্ষম হন। পরে কদল খানের অধীনস্থ আলী মুবারক নামক এক ব্যক্তি ফখরুদ্দীনের নিযুক্ত লাখনৌতির শাসনকর্তাকে হত্যা করায় লাখনৌতি তাঁর হস্তচ্যুত হয়। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ লাখনৌতি অধিকদিন নিজের অধিকারে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তার রাজ্য সীমাদক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সমুদ্র তখন বর্তমান চাঁদপুর শহর থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যেই ছিলো। চাঁদপুর অঞ্চলে স্থাপিত নৌবন্দরটি চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের পরিপুরক ছিলো। ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদের পর্যালোচনা করলে চাঁদপুর এর কচুয়া, হাজীগঞ্জ থানার কিছু অংশ ও মেহের শ্রীপুর অঞ্চলটি চাঁদপুর জেলার সবচেয়ে প্রাচীন হিসেবে পাওয়া যায়।

সুলতান ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ্ এর রাজত্ব কালে (১৩৩৮-৪৯) দেওয়ান ফিরোজ খান লস্কর তার খনন করা দীঘির পশ্চিম পাড়ে ৭৭৫ হিজরীতে একটি মসজিদ স্থাপন করেন। এই মসজিদটিই সম্ভবত বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সর্ব প্রাচীন মসজিদ। এটি হাজীগঞ্জ থানার সামান্য উত্তরে ফিরোজপুর গ্রামে অবস্থিত। গ্রামটির নামকরণ ফিরোজ খান লস্করের নাম অনুসারেই হয়েছে। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সমুদ্রের লোনাজল ও রাজ্যের মধ্যে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য চট্টগ্রাম-চাঁদপুর রাস্তাটি নির্মাণ করেন। তার সময়ে বাংলাদেশ উন্নত প্রশাসনিক কাঠামোর অধীন ছিলো নৌ এবং স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন হয়েছিলো। পরগনা, তহশীল, মৌজা, গ্রাম/ নামক প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিলো। পুর অর্থ্যাৎ প্রশাসনিক একক, প্রশাসনিক কেন্দ্র সম্বলিত গ্রামগুলোকে বলা হতো পুর যেমন চাঁদপুর, অলিপুর, আশ্রাফপুর, ফিরোজপুর, বাণিজ্যিক কেন্দ্র গুলোকে বলা হতো গঞ্জ যেমন ফরিদগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, কাতাল গঞ্চ, মুদাফরগঞ্জ ইত্যাদি। প্রশাসনিক ব্যবস্থার এমন বিকেন্দ্রীকরণ তার পূর্বে বা পরে অন্য কোন শাসক করেন নি। দেওয়ান ফিরোজ খান লস্কর কৃষি কাজ ও নৌবাণিজ্যের জন্যে ১৫ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের একটি নৌপথ তৈরী করেছিলেন যা এখনো ফিরোজ খানের নৌ দাঁড়া আসবে বর্তমা।

১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে মেহের শ্রীপুর অঞ্চলে এসেছিলেন বিখ্যাত আউলিয়া হযরত রাস্তিশাহ। ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। মেহের শ্রীপুর এ তার মাজার অবস্থিত। বিখ্যাত হিন্দু সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর এই মেহেরই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেন। সিদ্ধিলাভের স্থানটিতেই গড়ে উঠেছে মেহের কালীবাড়ী। হযরত রাস্তি শাহের নামে এ অঞ্চলের নাম হয় শাহরাস্তি। এটি এখন একটি উপজেলা

সদর। এই উপজেলার পূর্ব প্রান্তে রয়েছে নাটেশ্বর দিঘী। দিঘীটি খুবই বিশাল যা এখনও সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। তার উত্তর পূর্ব কোনে রয়েছে একটি অনিন্দ্য সুন্দর তিন গম্বুজ মসজিদ এটি সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের রাজস্ব কালে নির্মিত। চাঁদপুর শহেরর ছয় মাইল পূর্বে শাহাতলী অঞ্চলটি বাগদাদ থেকে আগত দরবেশ শাহ মোহাম্মদ সাহেবের নাম থেকে হয়েছে। তিনি সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ধর্ম প্রচারের জন্য এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি সুলতানের নিকট থেকে নিস্কর জমি লাভ করেছিলেন। শাহতলী গ্রামের পশ্চিমে রয়েছে একটি গ্রাম নাম শিলন্দিয়া এখানে সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমলের একটি মসজিদ ছিলো। বর্তমানে এর অস্তিত্ব নেই, স্থানীয় জন সাধারণ পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছেন। গোলাবাড়ী দিঘীটি তখনও বর্তমান এবং সুন্দর ভাবে রক্ষিত হচ্ছে। নাটেশ্বর রাজার দিঘী, হায়াতে আব্দুল করিম কর্তৃক নির্মিত মসজিদ ও শাহশরীফ বোগদাদীর এ অঞ্চলে আগমনের সূত্র সমুহ থেকে একথা প্রমাণিত চাঁদপুর অঞ্চলে মুসলিম শাসন ত্রয়োদশ শতাব্দির শুর থেকেই স্থাপিত হয়েছে।

শাহরাস্তি উপজেলার নাটেশ্বর দিঘীর পূর্বপাড়ে রয়েছ হযরত শাহ শরীফ বোগদাদীর মাজার। তার নামানুসারে গ্রামটির নাম শরীফপুর। এখানে নির্মিত মসজিদটি নির্মাণ করেন একজন ধর্ম প্রাণ কোতায়াল। তিনি আরব বংশদভূত ছিলেন। শাহ শরীফ বোগদাদীর অনুসারী ছিলেন। তাঁর নাম হজরত হায়াতে আব্দুল করিম। হজরত শাহ জালাল ১৩০৩ সালে সিলেট জয় করেন, এই ঘটনার ৮৬ বছর পর শরিফপুর মসজিদটি নির্মাণ কাজ শুরু করেন হজরত হায়াতে আব্দুল করিম। নয় বৎসর সময়কালে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিলো বলে শিলালিপি থেকে জানা যায়।

ত্রয়োদশ শতক ও চৌদ্দশতকে নির্মিত স্থাপনা সমূহের অধিকাংশ এখন বিনষ্ট হলেও চৌদ্দ শতকের রাজনৈতিক খবর একেবারে বিরল নয়। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ফখরুদ্দীনের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ থেকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ চট্টগ্রাম সমেত সমগ্র পূর্ববাঙলার অধিকার লাভ করেন। তারপর সুলতান সিকান্দর শাহ (১৩৫৯-৮৯ খ্রী.) ও তার পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১১ খ্রীঃ) চৌদ্দ শতকের প্রথম দশক অবধি রাজত্ব করেন। আজম শাহেব আমলেই শরীফপুর মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আযম শাহের আমলে আরাকানরাজ নরমিখলে বা মঙ সাউ মঙ গৌড়ে আশ্রিত হন। (১৪০৪ খ্রীঃ) এবং জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩১ খ্রীঃ) ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রিত রাজা মঙকে আরাকান সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য আরাকানী বিদ্বানদের মতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহই (১৪৩৩-৫৯) মঙ সাউ মঙকে সিংহাসন পাইয়ে দিয়েছিলেন (বর্মা রিচার্স সোসাইটিস এ্যানিবারর্সারি ভলিউম ১৯৬০)। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০) যে বাংলা সহ চাঁদপুর অঞ্চলের শাসক ছিলেন তা কেবল মঙ সাউ মঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ থেকেই নয়, বিহারের দরবেশ মুজাফ্ফর শামস বলখী হজ যাত্রার সময় চট্টগ্রাম থেকে তার কাছে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তা হতেও জানা যায়। চাঁদপুর সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের শাসনাধীনে ছিলো, সে সময় তিনি চীন দেশে দুত পাঠিয়েছিলেন। চীনা সূত্রেও ধারণা হয় যে, আযম শাহর অধীনে সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ ছিল।

তারপর সইফুদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, গণেশ, মহেন্দ্র, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, শামসুদ্দীন আহমদ শাহ এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯) প্রভৃতি সুলতানের আমলেও চাঁদপুর গৌড়রাজ্যভুক্ত ছিল। ইতিহাসে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে। অতীত বাঙলার সুলতান ফখরুদ্দীন চট্টগ্রাম জয় করে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর অবধি রাস্তা (আল) তৈরি করিয়েছিলেন, এ রাস্তা শ্রীপুরের বিপরীত দিকে নদীর অপর পার থেকে শুরু করে নরসিংহপুরের মেঘনা পদ্মার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত নৌ বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এই বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ বনাম রাস্তা নির্মাণ সে কালে মুসলিম প্রকৌশলীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সমুদ্রের লোনা পানি থেকে ফসল ও

লোকালয় রক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই ছিলো বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্য। ফখরুদ্দীনের সময়ে নির্মিত মসজিদ প্রমান করে চাঁদপুরে তখন সুলতানের একটি সুদৃঢ় প্রশাসনিক কাঠামো বর্তমান ছিলো। চাঁদপুর অঞ্চলে তখন পাঁচটি পরগণা ছিলো এগুলি হচ্ছে 'ধরলই পরগণা', 'টোরা পরগণা', 'মেহের পরগণা' ও করদী পরগনা পুরচন্ডি পরগণা । সমগ্র বাংলায় তখন একটি সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো বর্তমান ছিলো বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার প্রথম দিকেও পুরাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিলো। মুসলিম শাসকদের সময়ে রাজ দরবারের প্রথম ভাষা ছিলো আরবি, পরে মোগল আমলে পাশী ভাষা রাজভাষা হিসেবে চালু হয়। বাংলা ছিলো সাধারণ মানুষের ভাষা এর লালন পালন মুসলিম শাসকদের আমলেই হয়েছে। বাংলা আর্থ সম্প্রদায়ের ভাষা নয়, এর উদ্ভাবন হয়েছিলো মুসলিম স্বাধীন সুলতানদের শাসন আমলে।

শাসন ব্যবস্থায় ইসলাম

বাংলাদেশে সাড়ে পাঁচ'শ বছরের অধিককাল মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তুর্কী, আফগান ও মোগল শাসনকর্তা, সুলতান ও নবাবগণ এ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন। জালালুদ্দীন ওরফে যদু এবং নবাব মুর্শিদ কুলী খানের ন্যায় এ দেশীয় ধর্মান্তরিত কয়েকজন মুসলিম শাসক ও কয়েক বছর বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন। এ সাড়ে পাচঁ'শ বছরের মধ্যে আবার দু'শ-আড়াই'শ বছর স্বাধীন সুলতানগণ বাংলাদেশ শাসন করেছেন। মোগল শাসনের শেষের দিকে মুর্শিদাবাদের নবাবগণ ও প্রায় অনুরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। নবাবগণ প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীন চিলেন না। রাজস্ব সংগ্রহ করার জন্যে দিল্লীর নিযুক্ত দেওয়ান ছিলেন। দিল্লীর মোগল বাদশাহদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রায় স্বাধীন রাজার মতোই আচরণ করতেন। প্রতিরক্ষার জন্যে নিজস্ব সেনাবাহিনী পোষণ করতেন। নিজেদের নামে সতন্ত্র মুদ্রা চালু করেছিলেন। একটি কথা প্রণীধান যোগ্য, মদীনার ইসলামী খিলাফতের অবলুপ্তির প্রায় সাড়ে পাচঁ'শ বছর পর বাংলাদেশে মুসলিম শাসনকাল শুরু হয়। মদীনার ইসলামী খিলাফত বা খিলাফতে রাশেদার পর ইসলামী বিশ্বে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রচলন করেন উমাইয়া বংশীয় শাসকগণ। তাদের পর এ পথে অগ্রসর হন আব্বাসীয় বাদশাহগণ।

দুর্ভাগ্যক্রমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উদ্ভাবক ইসলামী শাসন ব্যাবস্থা লোভ ও লালসার কারণে রাজতন্ত্রের বেড়াজালে আটকা পড়ে। সত্যিকার অর্থে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) তিরোধানের বত্রিশ বছর পর মুসলীম সমাজ ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা পড়ে। অর্থে মুসলিম শাসকগণ সুরাও সাকীতে মত্ত হওয়ার কারণে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও ষোড়শ শতকের শিল্প বিপ্লবের ধাক্কায় ব্যবসা বাণিজ্যে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে হীন বল হয়ে নব উত্থিত ইউরোপীয় শক্তি সমুহের সাথে যুদ্ধে বারবার পারাজিত হয়ে শাসকের জাত, দাসের জাতে পরিণত হয়। আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা ফিরে আসবো বাংলাদেশ তথা বাঙ্গালী জাতি সত্তার আবির্ভাব নিয়ে। আজকের বাঙালী জাতি সত্তার প্রকৃত রূপ দিয়েছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ। ইতিহাস সে কথাই বলে। বাঙ্গালীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অধ্বস্তন একটি সংকর প্রজন্ম। একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড, নির্দিষ্ট ভাষা, সংস্কৃতির শরীরে বাঙ্গালী জাতির সতন্ত্ররূপ দেন বাংলার মুসলিম শাসকগণ। বর্তমান বাঙ্গালী জাতি সত্ত্বা, বাংলা সাল, বাংলা ভাষা মুসলিম শাসক গৌষ্ঠির সৃষ্টি। আর্য-অনার্য নিয়ে অহংবোধ ও হীনমন্যতার কারণে মুসলিম পূর্ব শাসনকালে অখন্ড বাংলা বলে কোন ভূখন্ড ছিলো না। মুসলিম স্বাধীন সুলতান গণ সমতট অঞ্চল ঘিরে সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করেন।

সমতট ঃ এলাহাবাদে প্রাপ্ত সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপিতেই প্রথম সমতটের উল্লেখ পাওয়া যায়। একে গুপ্ত সাম্রাজ্যের এক সীমান্তে করদরাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃহৎসংহিতায় সমতট ও বঙ্গকে পৃথক অঞ্চল বলে নির্দেশ করা হয়েছে। Cunningham- এর মতে সমতট গঙ্গার বদ্বীপ যশোর, Ferguson ও Waltters - এর মতে ফরিদপুর ও ঢাকা। ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত থেকে সমতটের শুরু, সে হিসেবে বর্তমান চাঁদপুর জেলা সমতট ভুক্ত ছিলো। সমতট রাজ্যই পরবর্তীতে বঙ্গ এবং বর্তমানের বাংলাদেশ। পশ্চিম বঙ্গ রাঢ় রাজ্যভুক্ত। পশ্চিম বঙ্গ এবং বাংলা ভাষাভাষি অন্য অঞ্চল সমূহ কখন। সমতট বা বঙ্গের সাথে একত্রিত রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের একত্রিত থাকার সময়কাল খুব বেশিদিনের নয়। এই অঞ্চলে মুসলিম শাসকদের রাজত্ব কালেই বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল আস্তে আস্তে জনপদে পরিণত হয়। গড়ে ওঠে নতুন লোকালয় নতুন জন বসতি। এই লোকালয় সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা ভুমিতে বিস্তৃত হয়েছে। ধর্মপ্রচারে মহৎ উদ্দেশ্যে দ্বাদশ শতক থেকেই বাগদাদ থেকে মুসলিম সুফী সাধকরা ভারত বর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে আসতে শুরু করেন। এই সুফী সাধকরা একাধারে ধর্মপ্রচারক, সুদক্ষ সেনা নায়ক ও বিজ্ঞ প্রশাসক ছিলেন। ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগর হয়ে সমতট রাজ্যে প্রবেশ করেন। উন্নত নৌযোগাযোগের কারণে অতি অল্প সময়ে বাঙ্গলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েন। হজরত শাহজালালের সাথে আওলিয়াদের ৩৬০ জনের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ চাঁদপুর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে থেকে যান।

সাত শতকে হিউএনৎসাঙ সমতট রাজ্যকে কামরূপের দক্ষিণস্থ নিম্ন ও আর্দ্রভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর মতে রাজ্যের আয়তন ৩০.০০০ লি (প্রায় ৭০০০০ বর্গ কিঃ মিঃ) এবং রাজধানীর আয়তন ২০ লি (প্রায় ৪৬ বর্গ কিঃ মিঃ) ছিলো। ইৎসিঙ তাঁর পর্যটনকালে রাজভট্টকে সমতটের রাজা দেখেছিলেন। নারায়ণগঞ্জের আশ্রফপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপিদ্বয় এঁরই পিতা দেবখড়গের। কুমিল্লায় প্রাপ্ত সর্বাণীমূর্তি লিপিতে এঁর পূর্ব রাজাদের নাম আছে। সমতটের আদি রাজধানী ছিল কারমান্তা, এটি কুমিল্লা জেলার আধুনিক (বড়) কামতা গ্রামে ছিল। এখানে রাজধানীসুলভ নিদর্শনাদি এখনো বর্তমান। এক পা[]-লিপিতে প্রাপ্ত লোকনাথের আলেখ্য পরিচিতিতে চাম্পিতলাকে (কুমিল্লা জেলায়) সমতটের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে তথা সমতটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকজন স্বাধীন নরপতি রাজত্ব করেন। কোটালীপাড়ার পাঁচখানি ও বর্ধমানের একখানি তাম্রলিপি ও মুদ্রা থেকে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। এঁরা ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করতেন। হিউএন সাঙ যখন সমতট ভ্রমন করেন, তখন তিনি সেখানে ত্রিশটি সঙঘারাম ও দুহাজার ভিক্ষু দেখেছিলেন এবং জৈনসহ সর্বধর্মের লোকের বাস ছিল ও শতাধিক মন্দির শোভা পেত। হিউএন সাঙের শিক্ষক নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতটের রাজকুমার ছিলেন, এই সময়ের কোন বর্ণনায়ই চাঁদপুর অঞ্চলের উল্লেখ নেই। ধারনা করা হয় তখন চাঁদপুর ও লক্ষীপুর জেলার বেশির ভাগ অংশ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিলো। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ হাজার বছর পূর্বে সমুদ্র গর্ভ থেকে এই অঞ্চল সমূহের উত্থান। সমুদ্র বক্ষ থেকে জেগে ওঠা চর, দ্বীপ সমূহ কালে কালে বিস্তৃত সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় স্বন্দীপ ভূখন্ডের সমুদ্র থেকে জেগে ওঠার বয়স সহস্রাধিক বছরের বেশি। মুল ভুখন্ডের অনেক অংশ স্বন্দীপ অঞ্চলের চেয়ে নবীন।

সপ্তমশতকে হিউএনৎসাঙের পর্যটনকালে সমতট রাজ্য উত্তরে পুরোনো নিম্নব্রহ্মপুত্রনদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে পদ্মানদী অবধি বিস্তৃত ছিল। কুমিল্লা জেলার লোকশ্রুতি অনুসারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে লালমাই পাহাড়ের ধার ঘেঁষে সমুদ্র ছিল। যুগীদিয়া ও ভুলুয়া ছিল দ্বীপ। ফেনী অঞ্চল ছাড়া নোয়াখালির অন্যান্য অংশ ছিল সমুদ্রগর্ভে। সাগরের বক্ষে জায়গার পর 'তিতাস' নদীরূপে দেখা দেয়। ব্রহ্মপুত্রের মূলধারা কুমিল্লার দিকে প্রবাহিত ছিল। এ নদী ধ্রুম (ভলুয়া) নামে পরিচিত

ছিল। গতিহারা ধ্রুম বা 'ভলুয়া' নদীর চিহ্ন এখনো বর্তমান। চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু শেঙ চি'র পরিভ্রমনকালেও সমতটের রাজা ছিলেন রাজভট্ট। সমতট যদিও যুগ প্রাচীন ভূমি নিয়ে গড়ে ওঠেছিলো তবে এর দক্ষিণ অংশ সমুদ্র গর্ভেই ছিলো। ইতিহাস বিদগণ ধারণা করেন খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে আমাদের বর্তমান চাঁদপুর জেলার দক্ষিণ অংশ সাগরের জলে নিমজ্জিত ছিলো। হজরত শাহ মাহমুদ যখন বর্তমান শাহতলী এলাকায় আসেন তখন এলাকাটি সমুদ্রজলে ডুবে ছিলো।

প্রাচীন ইতিহাসের কোথাও জনপদ হিসেবে চাঁদপুরের বর্ণনা না পাওয়ার কারণে ধারণা করা হয়, চাঁদপুর অঞ্চলে অনেক দ্বীপ ও চর ছিলো যে গুলো পরবর্তী সময়ে নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ার কারণে একীভূত হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলে মুসলিম শাসকদের রাজত্ব কালেই বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল আস্তে আস্তে জনপদে পরিণত হয়। শাহতলীর উত্তর পশ্চিমে ভড়ংগাছচর দক্ষিণ পুর্বে রাঢ়ীর চর প্রমান করে এলাকাগুলো সমুদ্রের পানি দ্বারা বেষ্টিত ছিলো। হজরত শাহ মাহমুদ বোগদাদী ১৩২০ খ্রীস্টাব্দের পর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর হয়ে নৌপথে চাঁদপুর অঞ্চলে আসেন। হজরত শাহমাহমু বোগদাদীর চাঁদপুর অঞ্চলে আসার সময়টিতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বাংলার সুলতান শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২) হজরত শাহ মাহমুদ (র) তার সফরসঙ্গী (ক) হজরত শাহ কালিম উল্লাহ (পৌত্র) খ) হজরত বেগম কালিম উল্লাহ (গ) হজরত শাহ আমান উল্লাহ (প্রপৌত্র) (ঘ) বিবি জোহরা খাতুন ওরফে পাগলী বিবি সহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বোগদাদ নগরী ছেড়ে আসেন।

অপর দিকে হজরত মখদুম শাহ দৌলাহ ও তার সফলসঙ্গীদের নিয়ে একই উদ্দেশ্যে ইয়ামেন ছেড়ে আসেন। হজরত মখদুম শাহ দৌলাহ ছিলেন ইয়ামেনের বাদশাহ মুআয ইবনে জবলের দুই পুত্রের একজন। হজরত মখুদম শাহ দৌলাহর সাথে তার একমাত্র বোন ও তিন ভাগনে বাংলাদেশে আসেন। জানা যায় হজরত মখদুম শাহদৌলাহ ও হজরত শাহ মাহমুদ বোগদাদী বোখরা শহরে একত্রিত হয়েছিলেন। তারা জলপথে একত্রে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। শাহ মখদুমের শিক্ষক শামসুদ্দিন তাবরেজী ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তারপরই মখদুমদৌলাহ বোখরা ছেড়ে ভারত বর্ষে আসেন। তার সাথে বার জন দরবেশ ছিলেন। শাহ মখদুম সিরাজগঞ্জ জেলাধীন বর্তমানে তারই নামের স্মৃতিবহ শাহজাদপুরে থেকে ইসলাম প্রচার করেন। শাহ মাহমুদ বোগদাদী ছোট ছোট চরসমৃদ্ধ সমুদ্র কুলবতী বর্তমান চাঁদপুর জেলার এই অঞ্চলে আসেন। তার এ অঞ্চলে আসার পর ছোট ছোট জল বেষ্ঠিত ভূমি গুলোতে জনপদ গড়ে ওঠতে শুরু করে। শাহ মাহমুদ বোগদাদীর নামে অঞ্চলটির নাম হয় শাহতলী।

হজরত শাহা আহামেদ চাঁদ হজরত শাহজালালের অপর সাথী সমসাময়িক সময়ে চাঁদপুর অঞ্চলে আগমন করেন এবং রাজ নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমান চাঁদপুরের প্রায় বিশ মাইল নিম্নে একটি নদী বন্দর স্থাপন করেন। নদী বন্দরটি বর্তমানে মেঘনা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। শাহা চাঁদ আওলিয়ার নামেই অঞ্চলটির নাম হয় চাঁদপুর। পরবর্তীকালে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক এয়োদশ শতকে চাঁদপুর চট্টগ্রাম বাঁধ নির্মাণের কারণে অনেক ভূমি সমুদ্র গর্ভ থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সিলেট অঞ্চল থেকে সুরমা ও বরাক নামে দু'টি নদীর ধারা ভৈরব বাজারের কাছে এসে মেঘনা নাম নিয়ে পুরনো ব্রস্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। এরপর এ তিনটি মিলিত ধারা কুমিল্লা-চাঁদপুর-নোয়াখালী অঞ্চলকে পুর্বদিকে রেখে দক্ষিণ দিকে বয়ে গিয়ে সাগর পড়েছে। নতুন জেগে ওঠা এ অঞ্চলটির উত্তরে প্রাচীন পলল গঠিত ময়নামতি-লালমাইর অবস্থান। আর এটি সেকালে বড়জোর চাঁদপুরের মেহের পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনুমিত হয় এবং এই বক্তব্যটিই অধিকাংশ ইতিহাসবিদ গ্রহণ করেছেন। চাঁদপুর অঞ্চলের প্রাক মুসলিম প্রশাসনিক কাঠামোর প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না, প্রাপ্ত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুসলিম শাসন আমলেই বর্তমান চাঁদপুর জেলার অঞ্চল সমূহে সুদৃঢ় প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠেছে। হিন্দুদের দেব-দেবীর

স্মরণে নির্মিত কোন প্রাচীন মন্দিরের অবস্থান চাঁদপুর অঞ্চলে বিরল। লালমাই অঞ্চলের চন্ডিমুড়া পাহাড়ের কালী মন্দির ও শিবমন্দির ছাড়া এতদ্বঅঞ্চলে আর কোন পুরানো মন্দির নেই। স্থাপন রীতি পর্যালোচনা করলে মন্দির দুটোকে বৌদ্ধ স্থাপনা বলে ভ্রম হয়। ত্রিপুরা রাজ এ দু'টো নির্মাণ করেছিলেন। দু'হাজার বছর ধরে আরব বনিকগণ মেঘনা মোহনা থেকে আরকান উপকূল পর্যন্ত সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো।

পাঁচশত বছর পুর্বে ইউরোপের জাতি সমুহ আরবদের হটিয়ে সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু, পর্তুগীজরা এ ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলো। তাদের লক্ষ্য প্রথম থেকেই ভারত বর্ষের ওপর নিপতিত ছিলো। সে সময়ে যোগযোগ ব্যবস্থা ও নদী বেষ্টিত দ্বীপাঞ্চল হওয়ার কারনে পর্তুগীজ হানাদাররা বঙ্গের নিম্নাঞ্চল নৌ ঘাটি নির্মাণ করে ছিল। মুসলিম নৌ সেনাদের দুর্বলতার কারণে এই সব নৌ ঘাটিতে পর্তুগীজরা নিরাপদ থেকে সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে অত্যাচার লুণ্ঠন ও ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে। বাঙলায় আর্য আর আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে স্থল পথে এর প্রমাণ, ইতিহাসে অত্যান্ত সুস্পষ্ট। বাঙলার গঙ্গাসাগর ও উড়িষ্যার বৈতরণী তীরে আর্যদের আর্য-প্রভাব দৃঢ় ও গাঢ় হয় উঠেছিলো খ্রিষ্ট পুর্ব তৃতীয় শতকে। খ্রীষ্টপুর্ব তৃতীয় শতকের এবং মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপুর্ব দ্বিতীয় শতকের শিলালিপিতে এ তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া বাঙলার বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত কুষাণ আমলের মুদ্রাও আর্যাবর্ত তথা উত্তরভারতের সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নিঃসংশয় প্রমাণবাহী। এসব থেকে সহজেই অনুমান করা চলে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি খ্রীষ্টপুর্ব তৃতীয় শতকের পুর্বেই বাঙলা দেশে চালু হয়েছিলো। বাংলার দক্ষিণাঞ্চল যদিও হাজার বছরের বেশি পুরানো নয় কিন্তু জাতি হিসেবে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা তিন সহস্র বছরের প্রাচীন। সাগর থেকে ভেসে ওঠা নতুন ভূমিতে উত্তরের বাসিন্দারা ক্রমাগত বসতি স্থাপন করে ছিলো। চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষের পেশা সমুদ্র বাণিজ্য ও মৎস্য শিকারের সাথে জড়িত ছিলো।

ইউরোপসহ সারা পৃথিবীতে যখন মনুষ্য সভ্যতা বর্বর, নির্মম অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীকর্তৃক শাসিত হচ্ছিলো, সে সময়ে অর্থ্যাৎ খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ, শতাব্দীতে ইসলাম পৃথিবীতে আসে, মুসলিম জনগণের আকাঙ্খা ও নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্যই সব দেশে ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। পুর্ব ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও তথা সমগ্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও মালদ্বীপের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীনে ইসলাম তার সুশীতল বাণী নিয়ে তার অগ্রযাত্রার প্রথমশতাব্দীতেই উপস্থিত হয়েছিলো। একমাত্র ইসলাম ছাড় অন্যান্য সকল ধর্মমত বা নৃগোষ্ঠীর বংলা অঞ্চলে আগমন ঘটেছিলো স্থলপথে। ইসলাম প্রথম এসেছে নৌ-পথে, হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেষে, জল বেষ্ঠিত ছোট ছোট চর ও দ্বীপমালা নিয়ে গড়ে ওঠা অপুর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সবুজ এই দেশটি সকল বিদেশীর দৃষ্টি কাড়ে সেই হাজার বছর আগেই। আরব বণিকদের পথ অনুসরন করে এসেছে ইউরোপিয়ারা। অবশ্য তুর্কি, আরব, হাফসী, আফগান, মোগল সহ অন্যসকল মুসলিম শাসক সম্প্রদায় স্থল পথেই এসেছেন।

ভারত বর্ষে ইসলাম মুসলিম বিজেতাদের আগেই প্রবেশ করে ছিলো। বাংলার দক্ষিণ-পুর্ব উপকূলে মুসলিম বণিকদের সাহায্যে প্রথম যুগেই ইসলামের সত্য বাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তবে শক্তিশালী ঐতিহাসিক তথ্য -প্রমাণাদির অভাব এ যুগকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়। দক্ষিণ ভারতের মালাবারের অন্তর্গত চের দেশের রাজা চেরুমল পেরুমল শেষ নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা ইতিহাস স্বীকৃত। মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই যে মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই (খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে) ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্য বাণীর সংস্পর্শে আসে। নিশ্চয়ই আরব বণিকদের জাহাজ কেবল মাত্র ভারতের পশ্চিম উপকূলে এস থেমে যায়নি কারণ তৎকালে আরবদের বাণিজ্য পুর্বে চীন উপকূল

পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আর সপ্তম শতকে বঙ্গোপসাগর বর্হিবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিলো। বঙ্গোপসাগর কূলবর্তী হওয়ার কারণে চট্টগ্রাম বহু পুর্ব থেকেই নৌবানিজ্যে নিজের স্থান সমুজ্জল করে রেখেছিলো। একথা ধ্রুবলোকের মত সত্য উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে এর আবির্ভাবের প্রথম দিকে। দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলিম শক্তি বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। তখন থেকে ইসলাম রাজধর্ম হিসেবে বাংলা অহ্চলে স্বীকৃতি পায়।

চাঁদপুর ও লক্ষীপুর অঞ্চলের যে সমস্ত দ্বীপমালা সমূহে জনবসতি ছিলো তাদের অধিকাংশই আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের সংস্পর্শে আসে। কানিংহামের মতে 'সমতট' গঙ্গার বদ্বীপ যশোর অঞ্চল, Fergusson I Watters এর মতে যথাক্রমে ঢাকা ও ফরিদপুর। কিন্তু হিউ্এনৎসাঙ এরবর্ণনা অনুসারে চট্টগামও সমতট রাজের অন্তর্ভূক্ত থাকর কথা; এবং সাত শতকে সম্ভবত উত্তরে ব্রক্ষপুত্র, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে পুরাতন গঙ্গা বা পদ্মা (তথা আধুনিক মধুমতী নদী) বেষ্টিত ছিল সমতটরাজ্য। চাঁদপুর এই সমতট রাজ্যের অংশ ছিলো। কোনো কোনো বিদ্বানের মতো নয়শতকে এবং কারো কারো মতে সাত শতকের শেষে ও আটশতকের শুরুতে খড়গরা সমতটে রাজত্ব করতেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে সম্ভবত খড়গরাই সমতটে শাসক ছিলেন। I- Tsing - এ বর্ণনা মতে সাত শতকের শেষার্ধে ছাপ্পান্ন জন ভিক্ষুর ভারত ভ্রমনকালে শেঙচি সমতটে রাজভট্টকে রাজা দেখেছিলেন। আর্কোলজি দপ্তরের নথীপত্র বা বাংলা পিডিয়ার কোথাও হাজার বছরের প্রাচীন স্থান হিসেবে চাঁদপুরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি সম্ভবতঃ যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের দৃষ্টি ভঙ্গির কারণে হয়েছে।

পুর্বে বর্ণিত ইতিহাসের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অষ্টম-নবম শতক থেকেই স্থলপথে বাংলাদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসার আগে ষষ্ঠ, সপ্তম শতকে, নৌপথে ইসলামবঙ্গাদেশের দক্ষিণ পুর্ব অঞ্চল জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিলো। কিন্তু এ সময়কার এমন কোনো ঐতিহাসিক বিরণ আমাদের হাতে নেই যা থেকে এ কথা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, এ দেশে কোন পর্যায়ে ইসলামের আগমন হয়েছিল, কারা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কি পরিমাণ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। একাদশ শতক থেকে এ দেশে ইসলাম প্রচারের কিছু কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারি। আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট, একাদশ শতকের অনেক পুর্বে থেকেই এ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনাবলী ও স্থাপিত মসজিদ সমূহের গায়ে সাটানো শিলালিপি থেকে এ ধারণা সুস্পষ্ট চাঁদপুর অঞ্চল সমুদ্র থেকে জেগে ওঠার তিনশতকের মধ্যেই মুসলিম শাসন সুদঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিলো।

১২৫৯-১২৬৫ সালের মধ্যে হজরত শাহ জালাল পূর্ব বঙ্গে আসেন তার সাথে ৩৬০জন মতান্তরে ৩৫৯ আওলিয়া বাংলাদেশে আসেন। হজরত শাহ জালালের সাথী হজরত রাস্তিশাহ্ ১৩৫১ খ্রিঃ সালে মেহার অঞ্চলে আসেন। হজরত রাস্তিশাহ ১২২৪ খ্রিঃ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৭৪ খ্রিঃ মেহারে ইন্তেকাল করেন। মেহার অঞ্চলে তার অবস্থান প্রায় তিন যুগের । তিনি ১৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। হজরত শাহজালাল (র) ও ১৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। হজরত শাহজালালের সাথী, হজরত রাস্তি শাহ যখন গোরগোবিন্দের সাথে যুদ্ধ করেন তখন তার বয়স ছিলো ৮০ বছর তিনি হজরত শাহজালালের চেয়ে ২৪ বছরের ছোট ছিলেন, হজরত শাহজালাল ১২২৪ খ্রীঃ প্রথমবার দিল্লী এসেছিলেন। হজরত রাস্তি সাহেব সমসাময়িক সময়ে হজরত নিয়ামত শাহ , হজরত শাহ মাহমুদ বোগদাদী হজরত শাহমর্দান (মাদা খাঁ) হজরত হায়াতে আব্দুল করিম হজরত শাহ শরীফ বোগদাদী হজরত শাহ চাঁদ আওলিয়া সহ অনেক সুফী সাধক চাঁদপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করার জন্যে আসেন। এইসব মহান সাধকদের প্রায় সবাই ছিলে অকৃতদার সংসার বিরাসী। নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন মানবতার সেবায়। আল্লাহ্ রাহে জীবন উৎসর্গ

করাই তাদের জীবনে একমাত্র ব্রত ছিলো। তারা অকৃতদার হওয়ার কারণে তাদের কোন বংশধর বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না ।

সমুদ্র তলদেশ থেকে জেগে ওঠা একটি নতুন ভূখন্ডে তাঁরা ইসলামের মহান সাম্যবাদের যে ঝান্ডা প্রোথিত করেছিলেন যুগের বহু ঝড় ঝাপটার পরও তা শুক্ত ভাবে উড়ডীন আছে। মানুষে মানুষে ভোদভেদ দুর করে এক শ্রেণী হীন সমাজ ব্যবস্থার জন্যে তারা লড়েছেন। আজ অনেক অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পন্ডিতের ধারণা বাংলাভাষা তথা বাংলাদেশ হিন্দুদের সৃষ্ট কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পাকিস্তান আমলে পুর্ববঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বাংলা হিন্দুদের ভাষা ধারণা দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছিলো। অথচ বাংলা ভাষার বিকাশ লালন পালন হয়েছে মুসলিম শাসকদের দ্বারা। বাংলাদেশে আগত সুফী সাধকরা এদেশে সর্ব প্রথম মানবতাকে সকল মতের উর্ধে স্থান দিয়েছেন।

সপ্তম থেকে দশম শতক পর্যন্ত চার'শ বছরের ইসলাম প্রচারের কোনো বিস্তারিত বিরবণ আমাদের কাছে নেই। এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তা এ সম্পর্কিত ছিটেফোঁটা আভাস-ইঙ্গিত ও আন্দাজ-অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপর সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তরও নেই। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সাত'শ বছর একটি চিহ্নিত সময়কাল। এ সময় ইসলাম বাংলার চর্তুদিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং অচিরেই উর্বর এলাকার শ্রেষ্ঠ ধর্মের রুপ লাভ করে। এসময়ে চাঁদপুর অঞ্চলে পঞ্চাদশ শতকের মেহের শ্রীপুর, সাহাপুর অঞ্চলের দুর্গা মন্দির, লক্ষী মন্দির, কালী বাড়ি ছাড়া হিন্দু ধর্মের প্রাচীন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের একহাজার বছরের ইতিহাস এই ভূখন্ডে মুসলমানদের প্রাপ্তি ও সৃষ্টির ইতিহাস। দ্বাদশ শতক থেকে শুরু করে এ অঞ্চলে হিন্দু প্রভাব ক্ষুন্ন হতে হতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। মাঝখানে গিয়াউদ্দীন আযম শাহের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজা গনেশ ক্ষণস্থায়ী হিন্দু রাজত্ব কায়েম করেছিলো।

বাংলা, বাঙ্গালীর ইতিহাস অন্য যে কোন ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি ইসলাম ধর্মাশ্রিত। অষ্টম শতকের শেষের দিকে এবং নবম শতকের গোড়ার দিকে সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের সাথে বঙ্গারাজ তথা বাংলার যোগাযোগ ছিল। সিন্ধুর মুসলিম ও বঙ্গারাজের মধ্যে দুত বিনিময় হতো। বাগদাদে তখন ছিল খলিফা হারুনুর রশিদের রাজত্বকাল। হারুনুর রশিদের রাজত্ব মাকরান হয়ে সিন্ধুদেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের যে নৃপতি ধর্মপালের দরবারে এসেছিলেন তিনি সম্রাট হারুনর রশিদ নিযুক্ত কেনো গর্ভনর ছিলেন। এ হিসেবে হারুনুর রশিদের সাথে ধর্মপালের যোগাযোগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায় এ সময় বাগদাদ ও বাংলার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এমন কি বাগদাদ ও বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যার ফলে উভয় দেশের মনীষী পন্ডিতবর্গ বন্ধুদেশে গমন করে সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। পাহাড়পুর ও ও ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত হারুনর রশিদের আমলের যে মুদ্রা পাওয়া যায় তাও উভয় দেশের এ সম্পর্কের কথাই প্রমাণ করে। বিশপ জন এ. সোহান তাঁর 'সুফীইজম ইটস সেন্টস এ শ্রীনস' গ্রন্থে উভয় দেশের মনীষীবৃন্দের বন্ধুদেশে গমনাগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার অনেক পরে, বিজয়-উদ্বুদ্ধ চাকতাই-তুর্কীরা যখন দিল্লী-সালতানাতের কেন্দ্রভুমিতে আঘাত হানল, তখন তাদের শৌর্য-প্রভায় উদ্ভাসিত নতুন দিন শুধু সচকিত হয়েই উঠল না এই উপমহাদেশের জীবনধারাও চঞ্চল হয়ে উঠল নতুনত্বের আগমনে। এক দ্রুত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তা সম্পুর্নভাবে বদলে দিল বাংলার মুসলিম জনসাধারণের 'জাতীয়' চরিত্র আর ধ্বংস করে দিল উড়িষ্যার আফগান শাসকদের রাজনৈতিক জীবন। এই পরিবর্তনের প্রচন্ড সংঘর্ষের ফলে আফগান শাসকরা ছিটকে পড়লেন লোদী সাম্রাজ্যের পুর্ব প্রান্তে।

বাদশা বাবরের চার বছরের ব্যস্ত শাসনকালে এবং বাদশা হুমায়ুনের প্রথম পর্যায়ের দশ বছরের গোলযোগপূর্ণ রাজত্বকালেও আফগান শাসকরা তাঁদের পিছিয়ে পড়ার পক্রিয়ায় বাংলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হননি; কারণ, শের শাহ্‌র অভ্যুদয়ের আগ পর্যন্ত আফগান শাসকদের জন্য বিহার ছিল পূর্বাঞ্চলের শেষ প্রতিরোধ লাইন। যদিও বাদশা হুমায়নকে যুদ্ধে পরাস্ত করে শেরশাহ্‌ বাংলার রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন ১৫৩৮ সালে আর বাংলার শেষ আফগান শাসক রাজ্যের অধিকার মুগলদের হাতে তুলে দেন ১৫৭৬ সালে; এবং শেষ স্বাধীন আফগান প্রধান খাজা উসমান সিলেটে প্রতিরোধ সংগ্রামে নিহত হন১৬১২ সালে। ১৫৩৮ সাল থেকে এই সময়টুকুর মধ্যে বাংলা ছেয়ে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে সন্দীপ ও মেঘনা বিধৌত লক্ষীপুর চাঁদপুর অঞ্চলে (১৫৪০-১৫৪৮) পর্তুগীজ নাবিক ও সেনারা লোকালয় দখল করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তৈরী করে ছিলো। ১৫৪০-১৫৪৬ সালে বর্তমান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ এলাকায় বাণিজ্য কুঠির আড়ালে দুর্গ নির্মাণ করেছিলো পর্তুগীজরা। যে সময়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত স্রোতধারাকে অনুসরণ করে পর্তুগীজরা দেশের অভ্যন্তর ভাগে হানা দিতে শুরু করেছিলো। পর্তুগীজদের এই আনাগোনা, লুন্ঠন অত্যাচার মোগল শাসনের শেষ শক্তিধর সম্রাট আওরঙ্গাজেবের আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান ও ইসলাম খান পর্তুগীজ দস্যুদের দমনের জন্যে শক্তিশালী কামান সজ্জিত নৌবহরের সৃষ্টি করে পর্তুগীজদের প্রতিরোধ করেছিলেন। অবশ্য এর আগে ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহের সেনাপতি খিজির খানের সাথে পর্তুগীজদের সাথে মেঘনা মোহনায় প্রচন্ড নৌযুদ্ধ হয়েছিলো।

সুপ্রিয় পাঠক আমাদের মনে রাখতে হবে ইসলামের অভ্যুদয়ের সময়ে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা , পরে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার উদ্দেশ্য নিছক রাজ্য জয়, মানুষের উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বিস্তার, প্রজা নিপীড়নের মাধ্যমে কর আদায় এবং ঐ অর্থে রাজকীয় জাঁক-জমক দেখানো ও বিলাসী জীবন যাপন করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাংলার সাড়ে পাঁচ'শ বছরের মুসলিম শাসনামলে উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন শাসনকর্তাকে ক্ষমতার মসনদে বসতে দেখা যায়নি। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন শাসনকর্তা ইসলাম প্রচারে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং অনেকেই আলেম, সূফী ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার প্রচেষ্টার প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের, তাঁদের পরিষদবর্গ ও প্রশাসকম□লীর সাহায্যে অসৎ কাজের প্রসার ঘটেছে ও সৎ কাজের গতি মন্দীভূত ও তার সীমানা সংকুচিত হয়েছে। তাই এই আমলে সাধারণ জনগনকে সম্পৃক্ত করে এক সুষম, একক জমাট বাধা জাতি-হিসেবে বাঙ্গালীর উন্মেষ হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে আরব বনিকরা এদেশে এসেছেন খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকের আগেই। ইসলাম আরব বনিকদের মাধ্যমে এদেশে এসেছে ষষ্ট শতকে। ভাস্কোডা গামার পথ অনুসরণ করে ইউরোপীয় শক্তি সমুহ পঞ্চদশ শতকে বাংলায় এসেছে, তার বহু পরে অর্থাৎ দুইশত পঞ্চাশ বছর পরে ইংরেজরা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। ইংরেজ আমলে স্থাপিত স্থাপনা সমূহে আমাদের ঐতিহ্য নেই, রয়েছে তোষণ আর তাবেদারীর কলংকের জমাটবাধা স্মৃতির আধার। লোহগড়ের মঠ বা নাওড়ার মঠ গুলো ইংরেজ শাসন আমলের কলংক তিলক, চাঁদপুরের ইতিহাসের অন্ধকার দিক। চাঁদপুরের মুসলিম হোক হিন্দু হোক জমিদার শ্রেণী গুলোর উদ্ভব ইংরেজ রাজশক্তির সহযোগী গোলাম, তাবেদার হিসেবে আর তারা বাংলার শত্রু ছাড়া গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক নন । এমন একটি জমিদার পরিবার পাওয়া যাবে না যারা বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের তাবেদার বা দালাল ছিলেন না।

ইংরেজ রাজশক্তির সহযোগী হিসেবে এদেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের নামে ওরা সৃষ্টি করেছিলো এক ভয়ংকর কলঙ্কজনক ইতিহাস। ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারত বর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে এরা ছিলো ইংরেজদের দালাল ও দোসর।

মোগল ও নবাবী আমল

১৫৭৬ খৃস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ দিলীর মোগল বাদশাহ্‌দের শাসনাধীনে আসে। প্রথম দিকে প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত এ দেশে মোগলদের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বাংলাদেশে একজন মোগল সুবাদার ছিলেন এবং মাত্র কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছিল। রাজধানী গৌড় ও এ সেনানিবাসগুলোর আশেপাশেই মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশের অন্যান্য এলাকা চরম বিশৃংখলার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। আফগানরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের ঝা□া উড়িয়ে চলছিল। এ সময় মোগল বাদশাহ আকবরের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং 'দীন-ই-এলাহী' নামক নতুন ধর্মমত প্রচারের প্রচেষ্টার ফলে বাংলার পাঠানরা মোগল শাসনের বিরুদ্ধে অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কাজেই আকবরের শাসনকালে বাংলার মোগল সুবাদারগণ কেবলমাত্র এ পাঠান বিদ্রোহ দমনেই অতিবাহিত করেন। মোগলরা ধর্ম মতে ইসলামের অনুসারী হলেও তাদের শাসন আমলকে মুসলীম শাসন আমল বলতে কষ্ট হয়। প্রথম থেকেই মোগল বাদশা বাবর ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। আকবর ইসলামকে বাদ দিয়ে দিল্লীতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। বাদশাহ আকবর সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী হয়ে পড়েন। তার পত্নীরা ছিলো হিন্দু , তার সেনাপতি ও সভাসদ বৃন্দের ক্ষমতাধর অংশছিল হিন্দুধর্মালম্বী। রাজদরবার সম্পূর্ণ রূপে হিন্দুয়াণী সংস্কৃতি নির্ভর হয়ে পড়ে। আচার আচরণে কোথাও ইসলামকে খুঁজে পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়ে। মোগল শাসনের সম্পূর্ণ সময়টার মধ্যে বাদশাহ আরঙ্গজেবের শাসন কালটাই ইসলামী ছিলো।

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খৃস্টাব্দে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আমলে ১৬০৮ খৃস্টাব্দে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে মোগল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি, শৃংখলা ও সুশাসন প্রবর্তন করে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করে এর নাম রাখেন জাহাঙ্গীর নগর। এরপর থেকে একশ বছর পর্যন্ত রাজধানী ঢাকাতেই অবস্থিত থাকে। তাই রাজধানী হিসেবে ঢাকা খুবই প্রাচীন। সুবেদার ইসলাম খানের একটি নৌযান ছিল। এটি সময় সময় তার প্রশাসনিক দপ্তর ও বিলাসতরী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নাম ছিল চাঁদনী- যার নামে ঢাকায় চাঁদনী ঘাট নামে একটি ঘাট রয়েছে। জনশ্রুতি পর্তুগীজদের দমনের জন্য সুবেদার ইসলাম খান চাঁদনী জাহাজ যোগে চাঁদপুর অঞ্চলে এসেছিলেন। অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে পর্তুগীজ হার্মাদদের দমনের জন্যে চাঁদনী জাহাজে অবস্থান করেছিলেন। অপর দিকে তিনি চট্টগ্রামেও পর্তুগীজ ও মগ দস্যু দমনের জন্যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। চট্টগ্রাম জয় করে এর নাম রাখেন ইসলমাবাদ। অনেকে বলেন সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় চাঁদপুর।

পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান চলাকালে প্রশাসনিক কাজকর্ম তিনি চাঁদনী জাহাজেই করতেন, বর্তমান চাঁদপুর অঞ্চলে জাহাজটি দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছিলো। প্রাচীনকাল থেকেই সামুদ্রিক বন্দর বলে

চট্টগ্রামের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস, যদিও সে ইতিহাস ঋজু থাকেনি। রক্তে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাও চট্টগ্রামবাসীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম এর ফিডার বন্দর হিসেবে চাঁদপুর সংলগ্ন অঞ্চলে আরো বন্দর ছিল বলে জানা যায়। সে জন্যে চাঁদপুরে নানা জাতির সংমিশ্রণে সঙ্কর সমাজের উদ্ভব গোড়া থেকেই হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। এমনি সঙ্কর সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনও বৈচিত্র্যে জটিল হয়ে উঠে। মুসলিম ইতিহাসবিহীন প্রাচীন যুগের আর কোনো কোন প্রত্নতাতিক সংবাদ আমাদের কালে এসে পৌঁছেনি। তবে পরোক্ষ তথ্যের আলোকে একটি কল্পচিত্র আঁকা যায় মাত্র । রাজ্য শাসনের সাথে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা না থাকার কারণে শাসকের জাতি হিসেবে বাঙ্গালীর ঐতেহাসিক অবস্থান খানিকটা দুর্বল। আর বাঙালী জাতির অংশ হিসেবে চাঁদপুরের অধিবাসীদেরও একই অবস্থা। মোগল বাদশাহরা নিজেদের নিয়ে যতটা ব্যস্ত ছিলেন ততটাই আপোষকামী ছিলেন ধর্ম আর সতন্ত্রজাতি সত্তা নিয়ে। শুধু বাদশাহ আলমগীর অর্থাৎ আওরঙ্গজেব ছাড়া। তিনি গণমানুষের কল্যাণে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে কাজ করার প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এখনো চাঁদপুরে ছড়িয়ে আছে বাদশাহ্ আলমগীর আমলের অনেক মসজিদ অনেক নিস্কর জমি দ্বারা পরিচালিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মানুষের কল্যাণের জন্যে অনেক জলাশয় খনন করেছিলেন তিনি। অপরদিকে অন্য শাসকদের ছিল ভিন্ন চিত্র। সুলায়মান কররানীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররানী ছিলেন বাংলার শেষ আফগান শাসক। রিয়াযের বর্ণনা অনুসারে তিনি সর্বদা মদ পান করতেন ও নীচ শ্রেনীর লোকদের সাথে মিশতেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ও লোক-লশ্কর ছিল অসংখ্য, সাজ-সজ্জা ছিল বেশুমার, অর্থ ও সম্পদ ছিল প্রচুর। মোগল বাদশাহ আকবরের সাথে সংঘর্ষে ১৫৭৬ খৃস্টাব্দে তাঁর পতন ঘটে। তাঁর পতনের সাথে সাথে বাংলার ইতিহাসে আফগান যুগেরও পতন হয়। অবশ্য দাউদ কররানীর মৃত্যুর পরও বাংলার অনেক অংশে আফগান সেনা নায়কেরা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন। তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দমন করতে মোগলদের যথেষ্ট সময় লাগে। বাংলায় আফগান তথা পাঠান শাসনের একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে, মুগল বিজয়ের আগে পর্যন্ত বেশ কয়েক শ' বছর বহির্বিশ্ব থেকে বাংলা ছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন এবং স্যার সরকারেরই মতে, এই বিচ্ছিন্নতার অবসান সূচিত হয় মুগল বিজয়ের পর যখন মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভক্ত হয় বাংলা। পাঠান আমলেই পূর্ব বঙ্গের এই অঞ্চলের অন্যান্য এলাকার মতো আমাদের চাঁদপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিলো যে গুলো প্রশাসনিক দপ্তর হিসেবে শাসন কার্য ও রাজস্ব আদায়ে ব্যাপৃত থাকতো। লক্ষণীয় এই পরগনা সুমহের দপ্তর এলাকায় কমপক্ষে একটি করে বিরাটাকার দীঘি একটি করে মসজিদ রাজকীয় অর্থে নির্মিত হয়েছিলো। এখনও মসজিদ, দিঘী কোথাও কোথাও প্রশাসকদের ইটে বাধাই করা সমাধি পাওয়া যাচ্ছে। অলিপুর, আশ্রাফপুর, শিলন্দিয়া, শরীফপুর উজানী, শাহাতলী সহ অনেক গ্রামে এরূপ সমাধি আজে অটুট রয়েছে।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, মুগল বিজয়ের আগে পর্যন্ত সত্যিই বাংলা কি স্বাধীনতা লাভের কারণে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল? স্বাধীন বাংলার পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকারের পরবতী ঐতিহাসিক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য হচ্ছে, স্বাধীন বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ ভারতবর্ষেরই জৌনপুর রাজ্যের সুলতানের কাছে উপঢৌকন স্বরূপ হাতী পাঠিয়েছিলেন। "এই হাতী চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। চাঁদপুর জেলার পূর্বাংশ জুড়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলের অনেক কীর্তি জড়িয়ে আছে। শরীফপুর গ্রামের তিনগম্বুজ মসজিদ এখনো বর্তমান। এটি নির্মাণ করেছিলেন এক রাজকর্মচারী হায়াতে আব্দুল করিম। তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ নিযুক্ত কোতোয়াল ছিলেন। নাটেশ্বর রায় (পরবতীতে মুসলমান) তখন মেহার পরগণার অধিপতি ছিলেন। উত্তর ভারত থেকে ছিটকে পড়া আফগান প্রধান এবং মুগলদের হাতে রাজ্যহারা বাংলার আফগান রাজরাজড়াদের বংশধরেরাই সৃষ্টি করেন আমাদের এলাকার অনেক সামন্ত জনপদ ছোট ছোট রাজ্য। তারপর একসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফগান শক্তিও উৎখাত হয়ে যায় বাংলা থেকে। হাজিগঞ্জ উপজেলার

ফিরোজপুর তেমন একটি জনপদ। সুপ্রাচীন রাজবংশের সন্তান না হয়েও এসব বীর প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লী বাহিনীর কাছে সানন্দে আত্মসমর্পণ না করে তাদের মোকাবিলা করেছিলেন বীরের মতো। অনেক আফগান শাসকের। বংশধররা এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন দেশময়। এর থেকে ধারণা করা যায়, দেশপ্রেমে তাঁদের নিশ্চয়ই কিছুটা ছিল এবং তারই প্রেরণায় দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলাকে রক্ষা করতে। তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্ত পরাজিত হয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী দিল্লী বাহিনীর মোকাবিলা করেই। পরবর্তী ইংরেজ ও মোগলদের সাথে আফগান শাসকদের একটা চরিত্র গত পার্থক্য ছিলো, আফগান ও শাসকরা বাংলার মাটির সাথে মিশে ছিলেন, বাংলা বার ভূঁইয়াদের আমল ইতিহাসে অন্য এক স্বর্ণযুগ।

ইতিহাসবিদ ডক্টর আলী, মুসা খান ও তাঁর সহযোগী "ভূইয়া" দের রাজ্যসহ নামোলেখ করেছেন এভাবে ঃ (১) মসনদ-ই-'আলা মুসা খান এবং তাঁর চার ভাই দাউদ খান, আবদুলাহ্ খান, মাহ্মুদ খান ও ইলিয়াস খান (রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল ঢাকা-ময়মনসিংহ-ত্রিপুরা জেলায়); (২) ঢাকা জেলার ভাওয়াল ও চউরা অঞ্চলের অধিপতি বাহাদুর গাজী ও তাঁর পরিবার; (৩) হাজী ভকুল-এর পুত্র শেখ পীর (রাজ্যাঞ্চলের কথা জানা নেই); (৪) পাবনার চাটমোহর এলাকার অধিপতি মাসুম কাবুলী ও তদীয় পুত্র মির্জা মু'মিন; (৫) কেদার রায় (ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের অধিপতি; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে অঞ্চল মুসা খানের রাজ্যভুক্ত হয়); (৬) পাবনা জেলার খালাসী এলাকার প্রধান মধু রায়; (৭) ঢাকা জেলার চাঁদ প্রতাপের জমিদার বিনোদ রায়; (৮) সরাইলের উত্তরে মাতঙ্গের প্রধান 'পাহালওয়ান'; (৯) উড়িষ্যার কতলু খান লোহানীর ভ্রাতুষ্পুত্র খাজা উসমান এবং তাঁর পুত্র ও তিন ভাই (ময়মনসিংহ জেলার বোকাইনগর ও পরবর্তীতে সিলেট জেলায় ছিল তাঁর প্রতিরোধ দুর্গ); (১০) সিলেট জেলার বানিয়াচং-এর অধিপতি আনওয়ার খান ও তাঁর ভাই হোসেন খান; (১১) মধ্য ও উত্তর সিলেটের অধিপতি বায়েজীদ কররানী ও তাঁর ভাই ইয়াকুব কররানী; এবং (১২) ফরিদপুর জেলাস্থ ফতেহাবাদের প্রধান মজলিস কুতুব। এই তালিকা থেকে বুঝা যায় চাঁদপুর বিক্রমপুর রাজ্যের অধীন বা চাঁদরায়ের রাজ্যধীন ছিলো এমন কোন সুদৃঢ় প্রমাণ ইতিহাসে নেই, তাই চাঁদপুর নামকরণে চাঁদরায়ের নাম ব্যবহার নিতান্তই কল্পনা প্রসূত বলে ইতিহাসবিদগণ ধারণা করেন। সমুদ্র বক্ষ থেকেজেগে ওঠা ভুভাগ ও ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমাংশ নিয়ে আজ যে চাঁদপুর জেলা গঠিত হয়েছে। ইংরেজ আমলের আগে সতন্ত্র রাজ্য হিসেবে এর কোন অস্তিত্ব ছিলো না।

"These were the associates and allies of Musa Khan whom Mirza Nathan and other contemporary sources call `Bara Bhuiyans.' ডক্টর আলীর মতো অনেক ঐতিহাসিক একইভাবে বাংলার বার ভূঁইয়াদের ইতিহাসে সনাক্ত করেছেন।

এইসব আমলে অর্থাৎ বার ভূইয়াদের শাসন আমলে সংখ্যাগুরু অমুসলিম সমাজ ও বিপুল সংখ্যক ধর্মান্ত রিত এ দেশীয় মুসলমান সমাজের নৈতিক জীবন-গঠনের কোন প্রচেষ্টাই শাসকদের তরফ থেকে করা হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সুলতান, নবাব ও উচ্চ পদস্থ শাসক সমাজের অনভিপ্রেত জীবনধারা ও ইসলামী অনুশাসন বিরোধী নীতি-প্রকৃতির প্রভাবে সাধারণ মুসলীম সমাজ ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে। সুলতান ও নবাবদের বিলাসিতার কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, তাঁদের অধীনস্থ জমিদারগণও কম বিলাসী ছিলেন না। ষোল শতকের কবি বিপ্রদাসের বর্ণনা মতে, হাসান নামক জনৈক মুসলিম জমিদারের ১০০টি উপপত্নী সর্বক্ষন তাঁর হারেম অলংকৃত করে থাকতো। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে পর্তুগীজ বারবোসা বাংলাদেশের একটি প্রধান বন্দরের সম্ভ্রান্তমুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন, '' .....তারা খুব বিলাসী, মেয়ে-পুরুষই উভয়ই উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্যপানে অভ্যস্ত। প্রত্যেকের ৩/৪ বা

ততোধিক স্ত্রী। ..... নৃত্য-গীত তাদের খুব প্রিয়"। যুদ্ধের চেয়ে বিলাসে বাঙ্গালীরা বেশি পারদর্শী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শাসক সমাজের অসৎ কাজে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকিরও সম্মুখীন হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত বাঙলার দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খান সুবাদার শাহজাদা আজিমুশশানের অবৈধ আয়ের পথ বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি দেওয়ানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও খেলাফায়ে রাশেদীন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি থেকেও মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী প্রতিষ্ঠিত এ মুসলিম রাষ্ট্রটি ছিল বহুদূরে অবস্থিত। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি ছিল তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি। এ অলংকারে রাষ্ট্রপ্রধানগণ সুসজ্জিত হতেন। রাষ্ট্রের কর্মচারীবৃন্দ, বিচারপতি ও সেনাপতিগণও এ এসবগুনে পরিপূর্ণ হতেন। অতঃপর সমগ্র সমাজ সব ক্ষেত্রে এর ধারা প্রবাহিত হতো কিন্তু রাজতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠিত বখতিয়ার খলজীর মুসলিম রাষ্ট্রটি প্রকৃত অর্থে প্রথম থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো না। চাঁদপুর অঞ্চলে তথা বাংলায় মুসলীম শাসন হাজার বছরের পুরোন হলেও সম্রাট আলমগীর অর্থ্যাৎ আওরঙ্গজেবের আমলটাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ এ সময় এখানে রাজকোষের অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে অনেক মসজিদ, দিঘী, রাস্তাঘাট ও সমৃদ্দ প্রশাসনিক দপ্তর। সমর্থবান টেকসই অর্থনীতির জন্যে অনেক বন্দর গড়ে উঠেছিল বঙ্গোপসাগর ও বড় নদীর তীর ঘিরে। সে সময়ে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের কারণে বাংলার দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামী জীবনাদর্শ পরিপূর্ণ রূপলাভ করে এখানে।

মুসলীম সম্প্রদায় নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান দ্বারা পল্লবিত হতে শুরু করে। শাহ-সূজা ও আওরঙ্গজেবের শাসনকালে সুবে বাংলায় অসংখ্য মসজিদ রাজ কোষাগারের অর্থে নির্মিত হয় একথা প্রবন্ধে আগেই বলা হয়েছে। হাজীগঞ্জের ছয় মাইল পশ্চিমে অলিপুর গ্রাম। এ গ্রামে দু'টি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। একটি শাহ সুজার আমলে নির্মিত সুজা মসজিদ। অপর মসজিদটি মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত আলমগিরি মসজিদ নামে পরিচিত। এটি নির্মাণ করেছিলেন পরগনা অধিপতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (১৭০২ খ্রীঃ)। আলীগঞ্জে মাদাখাঁ নামের এক দরবেশের নামে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়,বর্তমান মাদাখাঁ মসজিদ। অলিপুর আলমগীর মসজিদ নির্মাণের ৩৬ বছর পর স্থানীয় জনগণের অর্থানুকূলে মসজিদটি নির্মিত হয়। এ থেকে অনুমিত হয় রাজ অর্থানুকূল্য ছাড়াও এতদ অঞ্চলের মুসিলম সম্প্রদায় নিজেদের অর্থে সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। চাঁদপুর সদর থানার মৈশাদী ও শাহরাস্তি থানার শ্রীপুরে জনগণের অর্থে গড়া সুন্দর সুন্দর মসজিদ রয়েছে।

অলিপুরের মসজিদের নির্মাতা মোঃ আব্দুল্লাহ একজন তহশীলদার (মহকুমা প্রশাসক পর্যায়ের) ছিলেন। পদমর্যাদায় মহকুমা প্রশাসকের মতো ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এ প্রশাসকের প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে এখানে মোঘলদের ঘোড় সওয়ারসহ পদাতিক সৈন্যরা থাকতো। ১৬টি ঘোড়া পাশাপাশি এক সঙ্গে দৌড়ানোর মত বিস্তৃত ঘোড় দৌড় মাঠের (গোপাট) অস্তিত্ব কয়েক বছর পূর্বেও এই গ্রামে দৃশ্যমান হতো। এ গ্রামের 'বাংলা বাড়ি' থেকে ডাকাতিয়া নদীর তীরে কাজী বাড়ী পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার ব্যাপী এ গোপাটটির অবস্থান ছিল। এখানো থাক-নকশায় এ গোপাটের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা আছে। এ গ্রামের উক্ত কাজী বাড়ির কাজীরা বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। এখন কাজী বাড়িতে কাজীরা না থাকলেও তাদের পুকুর (কাজীর আন্দি) আজো রয়েছে, যা গ্রামবাসীদের নিকট স্বচ্ছ পানির আধার হিসেবে খ্যাত। মোগল শাসন আমলে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত অলিপুর গ্রামটি হাজীগঞ্জ থানার পশ্চিম-দক্ষিণের সর্বশেষ গ্রাম। এ গ্রামের লাগ পশ্চিমেই চাঁদপুর সদর থানার মনিহার গ্রাম।

এর পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে সম্পূর্ণ এবং পশ্চিম ও উত্তরে কিয়দংশ ডাকাতিয়া নদীর অবস্থান। বলা যায়, নদী পরিবেষ্টিত বিরল একটি গ্রামই হচ্ছে অলিপুর। এ গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ডাকাতিয়া নদী পেরুলেই ফরিদগঞ্জ থানার সুবিদপুর (উঃ) ইউনিয়নের বদরপুর গ্রাম এবং পূর্বপাশে সমেশপুর গ্রাম। উত্তর পাশে গ্রামটির উত্তর-পশ্চিম অংশে রয়েছে 'বাংলা বাড়ি'। আজকাল সার্কিট হাউজ বলতে যা' বোঝায় তখন 'বাংলা বাড়ি' ছিল তা-ই এই বাড়িটিও একটি বিরাটাকার দিঘীর পাড়ে অবস্থিত। পরিদর্শনের জন্যে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিরা ডাকাতিয়া নদী দিয়ে এসে এ বাড়িতে থাকতেন। তহশীলদার থাকতেন গ্রামের প্রায় মধ্যবর্তী অংশে। তিনি তার প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে চারপাশে যেভাবে আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তার নিদর্শন এখনো বিদ্যমান। প্রশাসকের বাড়ির সবচাইতে নিকটে (পশ্চিমে) রয়েছে বরকন্দাজ (পাহারাদার) বাড়ি, আরো পশ্চিম-দক্ষিণ কোনে মোল্লা (মসজিদের মোতওয়াল্লী) বাড়ি, তার সংলগ্ন কাজী (বিচারক) বাড়ী, পূর্ব পাশে পাটওয়ারী (কেরানী) বাড়ী, মজুমদার (হিসাবরক্ষক) বাড়ী, পূর্ব দক্ষিণে মীর (কোষাগার রক্ষক বা নাজির) বাড়ি, তার পূর্ব পাশে মুন্সী (দলিল দস্তাবেজ লিখক) বাড়ি এবং এ বাড়ির উত্তর পাশে অলিপুর বাজার।

এসব নামে বাড়িগুলো এখনো পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যারা বসবাস করছেন তারা সবাই অন্যস্থান থেকে আগত। অলিপুর বাজারে ব্যবসা করতো হিন্দু সম্প্রদায়ের এমন সাহা ও পোদ্দার, ধোপা, নাপিত মৃৎশিল্পের কারিগর কুমোর-কামারের বাড়িও রয়েছে এ গ্রামে। ডাকাতিয়া নদীকে জীবিকা নির্বাহের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণকারী মৎস্যজীবি দাস ও নৌকার চালক মাঝিদের বাড়িও রয়েছে এ গ্রামে। গ্রামের 'থাক-নকশায়' প্রশাসকের বাড়িসহ তার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাড়ির সাথে সংযোগ রক্ষাকারী গোপাটগুলোও দেখা যায়। এভাবে কাগজপত্র ও দলিলাদি পর্যালোচনা এবং কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে না যাওয়া কিছু নির্দশন গ্রামটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও শত শত বছরের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। মোগল গ্রাম অলিপুর-এর গোড়া পত্তন হয়েছিলো শের শাহের আমলে বলে কেউ কেউ ধারণা করেন, তবে এর সমর্থনে কোন দলিল পত্র পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি আছে গ্রামের মধ্যস্থলের ঈদগাহ ময়দানটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত হয়েছিলো। বছর পঞ্চাশেক আগে গ্রামের লোকজন ঈদগাহ ময়দানের মিম্বর ও পুরাতন স্থাপনা ভেঙ্গে নতুন করে ঈদগাহ ময়দানটি পুনঃ নির্মাণ করেছেন ফলে পুরনো স্থাপনা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলের ঈদগাহটিকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। নতুন নতুন ঈদগাহটি দেখে বুঝার উপায় নেই এটি কত প্রাচীন।

গ্রামটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রামটিতে প্রশাসনিক ভিত্তির গোড়াপত্তন হয়। চর্তুদিকে নদী পরিবেষ্টিত ছিল বলে মোগলরা সমৃদ্ধ নৌ-পথের কারণে এ গ্রামটিতে তহশীল কাচারী গড়ে তোলেন। জানা যায়, এখানে একটি সেনা নিবাস ছিল। বর্তমান চাঁদপুর অঞ্চলের তৎকালীন চারটি পরগনার একটি টোরা পরগনার সদর দপ্তর ছিলো এ গ্রামে। গ্রামে দু'টো রাজকীয় মসজিদের অবস্থান প্রমাণ করে এখানে উচুঁ স্তরের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিলো। সেনা নিবাস ও ঘোড় সওয়ারদের ব্যবৃহত মাঠ থেকে বোঝা যায়, প্রায় চর্তুদিকে ডাকাতিয়া নদী বেষ্ঠিত হওয়া এবং ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে অবস্থিত হওয়ার কারণে, পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের দমনের জন্যে বা আত্মরক্ষার জন্যে এখানে সেনানিবাস থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এখান থেকে টোরা পরগণায় খাজনা আদায়ের কাজটি পরিচালনা করা হত। ধারনা করা হচ্ছে বর্তমান ফেণী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলায় বিদ্যমান ডাকাতিয়া নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা-অঞ্চল উক্ত টোরা পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ গ্রামের পাশেই সাচনমেঘ গ্রামের অংশবিশেষ টোরা মুন্সীরহাট এবং বর্তমান হাজীগঞ্জ পৌরসভার টোরাগড় গ্রাম উক্ত টোরা

পরগণার কথা মনে করিয়ে দেয়। মুন্সীর হাট ছিলো বানিজ্য কেন্দ্র। টোরাগড় গ্রামে সেনানিবাস বা দুর্গ ছিলো।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নিয়োজিত সুবেদার ইসলাম কান, পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করার প্রাক্কালে অলিপুর গ্রামের গোড়া পত্তন করেন বলে জনশ্রুতি আছে। টোরা পরগনার অন্যান্য রাজকীয় দপ্তরগুলো ও ডাকাতিয়া নদী তীরবর্তী ছিলো। অলিপুর থেকে ৫ কিঃ মিঃ দুরে ছোট সুন্দর নামে চাঁদপুর উপজেলাধীন একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি ডাকাতিয়া নদীর বাঁকে অবস্থিত। এখানে সুবেদার ইসলাম খানের সেনা বাহিনী ছোট সুন্দর গ্রামে কিছুদিন ঘাটি স্থাপন করেছিলো। পর্তুগীজ নৌ দুস্যদের সাথে যুদ্ধে নিহত সেনাদের ছোট সুন্দর গ্রামে দাফন করা হয়েছিলো। কবরস্থানের পাশে অনিন্দ্যসুন্দর একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিলো। মসজিদটি আজো আছে , যদিও এখানে তখন কেহ নামাজ পড়ে না। সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে কালের স্বাক্ষী স্বরূপ দাড়িয়ে আছে এক গম্বুজ মসজিদটি। চাঁদপুর জেলার সাবেক পিপি অ্যাড তোফায়েল আহমেদের বড়ি মসজিদটির কাছেই। লেখকের সাথে জনাব তোফায়েল এর মসজিদটি নিয়ে আলাপ হয়েছে।

হজরত শাহ মাহমুদ বোগদাদীর সাথে শাহতলী মৌজার আগত সফরসঙ্গী তাঁর পৌত্র হজরত শাহ কালিম উল্লাহর কন্যা বিবি জোহরা খাতুন ওরফে পাগলী বিবির সাথে ছোট সুন্দর গ্রামের হজরত ফকির পরান আলী বা বাজ ফকিরের বিয়ে হয়। হজরত পরান আলী বাজপাখী পুষতেন ও বাজ পাখী নিয়ে চলাফেরা করতেন বলে তার বসত বাড়িটিকে লোকে বাজ বাড়ি বলতো। ছোট সুন্দর গ্রামে যে অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদটি দু'শত বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় আছে, তার সাথে হজরত পরান আলী ফকিরের যোগসুত্র রয়েছে কিনা আজ আর তা জানার কোন উপায় নেই।

হজরত পরান আলী ফকির শাহকালিম উল্লাহ বোগদাদীর সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও অনুগত খাদেম ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বিবি জোহরা খাতুন ওয়ায়েজ পাগলাবিবিকে বিয়ে করে শাহাতলী খন্দাকার বাড়ি অর্থাৎ শশুরালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। হজরত শাহ মোহাম্মদ বোগদাদী ও জোহরা খাতুনের মাযার শাহাতলী গ্রামে রয়েছে।

সুবেদার ইসলাম খানের সময় থেকেই এ গ্রামেই থাকতেন উক্ত পরগণার তহশীলদার, যারা খাজনা পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতেন। অবশ্য একজন তহশিলদারের নামই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। অন্য সব মোগল গ্রামের মতো, এখানে পানীয় জলের জন্যে ৫টি দিঘী ও নামাজ আদায়ের জন্যে ২টি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিলো। ছোট মসজিদটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট এবং 'শাহী' বা 'আলমগীরি' নামক বড় মসজিদটি পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট। রাজকীয় অর্থায়নে ২৭ বছরের ব্যবধানে মসজিদ ২টি নির্মাণ করা হয়। মাত্র ৫০০ গজ দুরত্বে দুটো মসজিদের অবস্থান দেখে ইতিহসবিদরা ধারণা করেছেন, এখানে মোগলরা বেশ শক্ত ভিতের ওপর প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তুলে ছিলো। গ্রামটি সম্পূর্ণ নিস্কর ছিলো। মসজিদ দুটোর কিছু নীতিদীর্ঘ বর্ণনা তুলে ধরা হলো প্রিয় পাঠকদের জন্যে।

শাহী (বড়) মসজিদটি আবদুল্লাহ্ কর্তৃক ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে (১১০৪ হিজরীতে) নির্মাণ করা হয়। এ মসজিদটি নির্মাণের ২৭ বছর পুর্বে (১০৭৭ হিঃ ১৬৪৯ খ্রিঃ) ছোট মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। কুমিল্লা জেলার ইতিহাস গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যায়, সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা এ মসজিদটি নির্মাণ করেনবলে এটি সুজা মসজিদ নামে সমধিক পরিচিত। মসজিদের দৈর্ঘ্য ৪৮ফুট ও প্রস্থ ২৪ ফুট এবং দেয়ালের ঘনত্ব বা পুরুত্ব ৫ ফুট। উল্লেখ্য, শাহ সুজা এ মসজিদটি নির্মাণের দশ বছর পর ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার মোগলটুলীতেও প্রায় অনুরূপ তবে এর চাইতে বড় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

পরবতী সময়ের অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে এর পুর্ব রূপ আজ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ডাকাতিয়া নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে এবং ভূপ্রাকৃতিক কারণে অলিপুর গ্রামের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে নদী সরেগেছে এখন সম্পূর্ণ দক্ষিণ, পুর্ব ও উত্তর পূর্ব কোন নদী দ্বারা বেষ্ঠিত। প্রাচীনকালে চর্তুদিকে ডাকাতিয়া নদী থাকার কারণে গ্রামটি প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত।

বাংলাদেশে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষিতে আলমগীরি মসজিদটি বারান্দাবিহীন নির্মাণ করা হয়। আযান দেয়ার কোনো মিনারও দেখা যায় না মসজিদটিতে। মসজিদের ৬০ ফুট পুর্বে রয়েছে একটি বড় পুকুর। বড় মসজিদটির নির্মাণ সাধারণ মোগল স্থাপত্যরীতির তাৎপর্য্যপুর্ণ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় এ মসজিদে। সাধারণতঃ মোগলরা তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদই তৈরী করতো। কিন্তু এ মসজিদের আছে পাঁচ গম্বুজ। সে সময়ে প্রশাসককের মর্যদা অনুযায়ী মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা নির্ধারিত হতো বলে ধারণা করা হয়। রাজশাহী রংপুর অঞ্চলে বাদশাহ কর্তৃক নির্মিত পাঁচগম্বুজ, সাত গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ দেখা যায়, কিন্তু বাংলাদেশের দক্ষিণ পুর্বাংশের জেলা সমুহে পাঁচ বা সাত গম্বুজ মসজিদের অবস্থান খুবই বিরল ঘটনা।

মসজিদের প্রধান দরজার উপরে স্থাপিত রয়েছে ১.১০´´ ফুট দীর্ঘ ও সাড়ে এগার ইঞ্চি প্রস্থের পাশী ভাষায় লিখিত শিলালিপি । এ শিলালিপির অনুবাদ হচ্ছে – পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে; আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তার নবী; মহামতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে (যাঁর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষায় অনেক রাজন্যবর্গ আশ্রয় নিত); উপসানলয়ের গুনাবলী প্রকাশের জন্যে পৃথিবীতে অনেক ঘটনাই ঘটে। আমি যখন এর প্রতিষ্ঠার কথা জানতে চাইলাম, অকস্মাৎ একটি কণ্ঠস্বর আমাকে এর সাল জানালো; এ মহান মসজিদটি নির্মিত হয় আমি আবদুল্লাহ্ কর্তৃক (যে চার সঙ্গী–বকর, ওমর, ওসমান ও আলীর শিষ্য) ১১০৪ হিজরীতে। চার সঙ্গীর শিষ্য বলতে নির্মতা সুন্নী মুসলিম ছিলেন বলে ধারণ করা হয়। মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারা ইসলাম গ্রহণের সময় থেকেই সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। কচুয়ার উজানী গ্রামের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের শিলালিপিতে ও চার সঙ্গীর অনুসারী কথাটা লিপিবদ্ধ আছে।

মসজিদের নির্মাতা আবদুল্লাহ্ সম্পর্ক তেমন আর কিছু জানা যায়নি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বান যখন বাংলার গভর্ণর (সুবেদার) ছিলেন (১৬৯৬–১৭০৬ খ্রিঃ) তখনই আবদুল্লাহ্ নির্মাণ করেন এ মসজিদ। শাহী মসজিদের প্রায় একই সমান্তরালে মাত্র ২০০ মিটার দুরে অবস্থিত অপর মসজিদটির নির্মাণের সময় তহশিলদারকে ছিলেন এখন পর্যন্ত জানা যায়নি । স্থানীয় মসজিদ কমিটি নিজস্ব বিচার–বুদ্ধিতে সংস্কার করতে গিয়ে মুল আকার–আকৃতির কিছুটা বিকৃতি ঘটিয়েছে। এটি মোগলদের প্রচলিত স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত অর্থাৎ তিন গম্বুজবিশিষ্ট। এটি পাঁচওয়াক্ত নামাজের মসজিদ অর্থাৎ 'পাঞ্জেগানা মসজিদ' হলেও বর্তমানে এটিতেও শাহী মসজিদের ন্যায় জুমার নামজ আদায় করা হয়। এ মসজিদের সামনে রয়েছে বড় পুকুর ও তার পূর্ব পাড়ে ঈদগাহ। বর্তমান সংস্কারের আওতায় পড়ে ইদগাহটিকে দেখে মনে হয় নতুন। জানা যায়, মসজিদ দু'টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে বাদশা কর্তৃ দেয় প্রচুর ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে যার প্রায় সবটুকুই ক্রমান্বয়ে নানাজনের দখলে চলে গেছে, যেগুলো আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু কিছু সম্পত্তি এখনো মসজিদ কমিটির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অলিপুর গ্রামটি মোগলী আমল থেকে ব্রিটিশ শাসন আমল পর্যন্ত নিস্কর ছিলো এ কথা পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনত্বের কারণে ও নিস্কর থাকার ফলে মসজিদের কোন দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষিত, ফলে প্রকৃত ইতিহাস বের করা খুবই কষ্ট কর।

প্রায় তিনশত বছর পুর্বে এ মসজিদের মোতওয়াল্লী ছিলেন সৈয়দ দাইমউদ্দিন মোল্লা। বহু দিন মসজিদ পরিচালিত হতো বাদশাহ আলমগির কর্তৃখ ওয়াকফকৃত জমির আয় থেকে, পরবতী সময়ে মুলতঃ বৃটিশ

শাসন আমলের শেষ দিকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিগুলো বেহাত হওয়া শুরু হয়। স্থানীয় প্রশাসন আন্তরিক প্রচেষ্টা চালালে মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সম্ভব বলে অভিজ্ঞজন মনে করছেন। এখানে একটি পাঠান বাড়ি আছে, এই বংশের মুল অংশ রয়েছে নদীর অপর পাড় অর্থাৎ প্রতাপপুর গ্রামে। এদের অবস্থান দেখে অনেকে ধারণা করেন গ্রামটি গোড়া পত্তন আফগান শাসকদের আমলে হয়েছিলো। সে হিসেবে শেরশাহের আমলে প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে ধারনা করেন। গ্রাম বাংলার আরো অনেক পল্লীতে পাঠান বাড়ি নামে বাড়ি রয়েছে, ওখানে বাস করেন সুবে বাংলায় আসা আফগানদের অধ্বস্তন প্রজন্ম।

আলমগীরি (শাহী) মসজিদের দৈর্ঘ্য ৫২.৮ ফুট ও প্রস্থ ২৯.৯ ফুট। মোগল স্থাপত্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এ মসজিদের চারটি অষ্টকোণাকার মিনার রয়েছে। মসজিদের ছাদে দু'পাশে দু'টি করে ৪টি ছোট গম্বুজ রয়েছে। পশ্চিম পাশের দেয়ালে তিনটি মিহরাবের অবস্থান। ইমাম নামাজ পড়ান যে মেহরাবে সেটিই বড় এবং দু'পাশের দু'টি ছোট। মসজিদের ভেতরের রয়েছে অষ্টভূজাকৃতি দু'টি বিশাল (স্থুল) স্তম্ভ (পিলার)। যেগুলোর বেড় বা পরিধি কমপক্ষে আট হাত। আর মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় আড়াই হাত (প্রায় ৪ ফুট)। মসজিদটিতে মুলত কোনো জানালা নেই। পূর্ব দেয়াল তিনটি দরজা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দু'টি করে যে ৪টি দরজা ছিল সেগুলোকে বর্তমানে জানালায় রুপান্তর করা হয়েছে। মসজিদের চারদিকের দেয়ালের মধ্যে পূর্ব দেয়াল ছাড়া তিন দিকের দেয়ালই সমতল। পূর্বদিকের দেয়ালে এক সময় ছিল নানান কারুকাজ। বর্তমানে সংস্কারের ফলে যার বিলুপ্তি ঘটেছে। সম্পূর্ণ চুন-সুরকি দিয়ে তৈরী হয়েছে মসজিদটি। এটিও মুল আকার-আকৃতি হারিয়েছে। ঈদগাহের দক্ষিণে রয়েছে ৪ জন অলির মাজার। এদের অন্যতম হচ্ছেন (সম্ভবতঃ) শাহী মসজিদের নির্মাতা আবদুল্লাহ। এ ৪ জন অলির নামে গ্রামটির নাম অলিপুর হয়েছে বলে অধিকাংশ গ্রামবাসীর নিশ্চিত ধারণা। প্রতি বছর ২৫ শে মাঘ চার অলির মাজারে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এ অনুষ্ঠানের সাথে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের কোন সম্পর্ক নেই। এই মাজারটি সম্ভাবত দেশের একমাত্র মাজার যেখানে জটাধারী কেনো মানুষের বা মাজরঘিরে যে পীর ফকিরের আস্তানা থাক সেরূপ কোন আস্তানা নেই। লোকজন সতঃস্ফুর্ত ভাবে আসে চাঁদা তুলে গ্রামবাসীরা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে থাকে। এখানে ফুরফুরা শরীফের ইসলামী চিন্তাবিদ আসেন, ধর্মীয় সভা করেন।

লেখক ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাঁদপুর জেলার আটটি উপজেলার সহস্রাধিক গ্রামের মধ্যে মাত্র কয়েক শত গ্রাম ঘুরে ফিরে দেখেছেন, এখনো জীবিত আছেন, বয়সে খুবই প্রবীণ মানুষজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। তাদের মুখ থেকে শোনা কাহিনী, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, উপকথা সমুহ বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের ওপর লেখা প্রাপ্ত বই সমুহ পর্যালোচনা করেছেন। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন বিদগ্ধ জনের সাথে আলাপ করেছেন কাজী শাহাদাৎ, জীবন কানাই চক্রবর্তী, পিযুষ কান্তি রায় চৌধুরী, প্রয়াত তফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। চাঁদপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান বাচ্চু মিয়াজী খাজা ওয়ালী উল্লাহ্ প্রমুখ এদের মধ্যে উল্লেখ করার মত কয়েকজন। উজানী মাদ্রাসার অধ্যক্ষের সাথে শিলালিপির বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলাপ করেছেন। উজানী দিঘীর পশ্চিম পাড়ে যুগের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ কারী ইব্রাহীমের স্মৃতি বিজড়িত উজানী গ্রামে বর্তমানে একটি বৃহৎ আধুনিক মসজিদ রয়েছে। এই মসজিদটির দক্ষিণ পশ্চিম কোনে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি তিন'শ বছরের পুরানো মসজিদ এখনো অক্ষত অবস্তায় রক্ষিত হয়েছে। লোকে বলে বখতার খাঁ শাহী মসজিদ।

১১১৭ হিজরী সালে বখতিয়ার খান নামে এক ফৌজদার মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। বখতিয়ার খার কার্যালয় ছিলো উজানী গ্রামে। বখতিয়ার খার পরে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে গ্রামটি জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো। উজানী গ্রামটির বেশির ভাগ অংশ বনজঙ্গালে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। প্রায় দেড়শ বছর আগে উজানী গ্রামে খাঁ চৌধুরী, কাজি, সরদার বংশের লোকজন উজানী গ্রামে আসেন এবং বন জঙ্গাল

পরিস্কার করে একটি বটগাছের শিকড়ে নিগড় থেকে মসজিদটি উদ্ধার করে। প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে মসজিদটির স্থাপন সমন্ধে জানতে পারা যায় ''পরম দয়ালু আল্লাহতালার নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ এক তাহার কোন শরীক নেই মোহাম্মদ তার রাসুল। বাদশা বাহাদুর শাহ গাজীর শাসন আমলে খাদেম আবুল হোসেন খাঁর পুত্র ইলিয়াস খাঁর পৌত্র। উল্লেখ বখতিয়ার খাঁর পূর্ব পুরুষের আমলে হজরত শাহ জালালের সহকমী হজরত নেয়ামত শাহ এই উজানী গ্রামের আসেন। উজানী গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে হজরত নেয়ামত শাহ্ ও তার পুত্রের দরগাহ। এ দরগাহ শরীফ ও নতুন বসতি স্থাপনকারী লোকজন জঙ্গল পরিস্কার করার সময় সন্ধান পান। বখতিয়ার খাঁ সুন্নী মসুলিম ছিলেন বলে শিলালিপিতে বর্ণনা রয়েছে।

দারা শাহী তুলপাই গ্রামের আবুল কাশেম নামে এক গ্রাম বাসির সাথে আলোচনা থেকে লেখক জানতে পারেন দারা শাহী জামে মসজিদের কথা । বাদশা শাজাহানের পুত্র দারাশিকোর ভক্ত এক ফৌজদার রাজকীয় অর্থে নির্মাণ করেছেন, দারশাহী তুলপাই গ্রামের এক গম্বুজ বিশিস্ট মসজিদটি। এখানে এখনো জুম্মার নামাজ পড়া হয়।

লেখকের পিতা সরকারি কর্মকর্তা মরহুম শামছুল আমীন সাহেব, পিতৃব্য মরহুম আবদুল হামিদ মাস্টার সাহেব শাহরাস্তি উপজেলার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুল আওয়াল, মতলব উপজেলার প্রয়াত দিল মোহাম্মদ সরকার, মতলবের রসুলপুর গ্রামের প্রবীণ জননেতা আাঃ মালেক উজানী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ চাঁদপুর মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক মনোহর আলী, শরীফপুর গ্রামের অধ্যাপক ওয়ালীউল্লাহ ও তার ভ্রাতা মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব নারায়নপুর গ্রামের হাফেজ আফজ্জালুর রহমান প্রমুখের সাথে আলাপ আলোচনার ফসল এই লেখাটি। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করার বিষয়টি খুবই দুরূহ আর একটি নতুন জেলার হাজার বছরের ইতিহাস বের করে আনা ততধীক কষ্টকর। তারপর ও প্রাপ্ত বই পুস্তক আলোচনা করে চাঁদপুর অঞ্চলকে ইতিহাসের বিবর থেকে বের করে আনার চেস্টা করা হয়েছে। লেখকের মনে এই আশা কোন বিজ্ঞ পাঠক রচনাটি পড়ে, চাঁদপুরের ইতিহাস সন্ধানে প্রবৃত্ত হবেন। তা যদি হয়, তাহলে চাঁদপুর জেলার একটা পূর্নাঙ্গ ইতিহাস অবশ্যই রচিত হবে।

জেলার ইতিহাস জানার সূত্র হিসেবে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করলে, আমাদের অতীত জানা সম্ভব হবে। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৫০), শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৫৮) গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ (১৪০৬) অত্যন্ত ভাল শাসক ছিলেন সাহসী ও মেধাবী হওয়ার কারণে (১৩৩৮-১৪০৬) অর্থাৎ তাদের শাসনের ৬৮ বছর বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ ছিলো। এ সময়ে চাঁদপুর অঞ্চলে আগমন ঘটে ধর্মযোদ্ধা ইসলামী চিন্তাবিদ ও অলী, হজরত রাস্তি শাহ , হজরত মাদাখাঁ , হজরত মোহাম্মদ শাহ, হজরত নেয়ামত শাহ, হজরত সিরাজ খান প্রমুখের। চাঁদপুর জেলার মতলব, হাইমচর, উপজেলার পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া বাকী অঞ্চলে মুসলিম শাসন আমলে খুবই সুদৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম ছিলো। সারা পৃথিবীর সবচাইতে সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে পরিণত হয়েছিলো সুবে বাংলার সমতট অংশ। মসলিন কাপড়, হাতির দাঁত, উৎকৃষ্টমানের কাঠ রাফতানীতে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে ওঠেছিলো। এঁদের শাসনকালে বাংলার সাথে আরব দেশ সমুহের সুদৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো।

ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকেই বাংলাদেশে মোগল শক্তির আনাগোনা বেড়ে যেতে থাকে। সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত বাংলায় মোগল শাসন অপ্রতিহত থাকে। মোগলদের উৎপত্তিস্থল মোঙ্গালিয়া অঞ্চল তৈমুরলঙ্গ বা তেমুচিনকে বলা হয় মোগল রাজ শক্তির প্রপিতা। ভোগ বিলাস আর চরম রক্ত পিপাসু একটি অভিযান প্রিয় সামরিক শক্তি রূপে মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে তারা ভারতে প্রবেশ করে।

ভারতীয় সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ যেমন সঙ্গীত, নৃত্যকলা, সমৃতি স্তম্ভ তৈরী ও নারী বিলাসে মত্ত হয় বিজয়ী মোগল রাজ শক্তি। যুদ্ধে বিজয়ী মোগল রাজ শক্তি ভারতীয় সঙ্গীতের মুর্ছনা ও ভারতীয় লাস্যময়ী নারীর রূপের সুধায় বিভোর হয়ে যায়। তাদের অদ্যম রনশক্তি হেরেমে বন্দি হয়ে যায়। মোগলরা আস্তে আস্তে প্রাসাদ প্রেমিক হয়ে ওঠে ওদের সৈন্যদের অমিত তেজ আর তরবারির ধার কমে আসতে শুরু করে। সেনা নিবাস সমূহে অস্ত্রের চেয়ে নারীর নৃত্য আর নারী সঙ্গ মুখ্য হয়ে ওঠে। মোগলরা যতটা না প্রজাদের কল্যাণ কামনা করতো তার চেয়ে বেশি নিজেদের পরিচিত করতে শুরু করে। যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ওরা হেরেমে সময় কাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় ভারত বর্ষের সংখ্যা গুরু সম্প্রদায় হিন্দুরা তাদের চিন্তা চেতনা ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে অনেক দুর এগিয়ে যায়। পৌরনিক যুগের ধর্মভিত্তিক ভারত সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কল্পে ধীরে ধীরে অগ্রসব হয় এবং একসময় দক্ষিণ ভারতে মারাঠারা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতে অমিত শক্তির অধিকারী হয় তারা। মুসলমানদের জীবনে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বাড়তে থাকে।

মুসলিম রাজ কর্মচারীরা তাদের সন্তানদের হিন্দু শিক্ষালয়ে পড়াতে শুরু করেন। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসা মুসলিম শিক্ষার্থীরা শুরু করে অনইসলামিক জীবন যাপন। নৃত্য গীত দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই কাটে হুমায়ন, আকবর, জাহাঙ্গীর আর শাহজাহানের সময়কাল অনইসলামিক ঘটনা প্রবাহ পার হয়ে । এক সময় মোগল সম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আরঙ্গজেব। আলমগীর (জিন্দাপীর) ভারতে মুসলিম শক্তির ক্ষয়ীষ্ণু অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্যে রক্ষায় ঘুরে দাঁড়ান ভারতে ধ্বংশপ্রায় মুসলিম রাজ শক্তির হাল ধরেন আওরঙ্গজেব। (১) তিনি বন্ধ করে দেন এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। (২) সেকালে নিয়ম হয়ে গিয়েছিল যে, এক ব্যক্তি অন্যকে সালাম করতে চাইলে মাথায় হাত রাখতো, মুখে কিছু বলতো না। আওরঙ্গজেব এই প্রথা তুলে দিয়ে সালামের পুণঃ প্রবর্তন করেন। মুসলমানরা পরস্পরের সাথে দেখা হলে আবার 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা শুরু করে। (৩) নিজের খরচের জন্যে আওরঙ্গজেব মাত্র কয়েকটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে নেন। বাকী সমস্ত বাদশাহী সম্পত্তি সরকারী তহবিলভুক্ত করে দেন। তাঁর জীবন যাপন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। তিনি নিজ হাতে যা উপার্জন করতেন তা দিয়ে নিজের খরচ যোগাতেন। তার পূর্বপুরুষের আমলে প্রজাগণ রাজাদেরকে প্রায় খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছিলো তা থেকে তাদেরকে নিশ্চেষ্ট করার জন্য তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সম্রাটকে মানুষের কাতারে নামিয়ে আনেন আওরঙ্গজেব। (৪) দরবারে সিজদাও ভূমি চুম্বন করার রীতি তিনি বন্ধ করে দেন। এই প্রথাকে অমানবিক ঘোষণা করেন। দরবারে নৃত্য , গীত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন বাদশা আলমগীর।

(৫) আওরঙ্গজেবের সময় ইসলামী শিক্ষার যে উন্নতি হয়েছিল ভারতবর্ষে, তা আর কোন কালে হয়নি। তিনি প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে আলেমদেরকে মাদ্রাসায় নিযুক্ত করে তাদের মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করে দেন, যাতে তারা নিরুদ্বেগচিত্তে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে যেতে পারেন। রাজ কোষাগার থেকে তাদেরকে বেতন দেয়া হতো। এর সাথে ছাত্রদের জন্যও পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন (মাআসিরে আলমগিরী-১৫২৮ খৃ. দ্রষ্টব্য)। বেনারসে নদওয়াতুল ওলামার কর্মগুলো যা প্রদর্শিত হয়েছিলো এর মধ্যে একমাত্র বাদশাহ আওরঙ্গজেবেরই ছিল দুই-তৃতীয়াংশ। এ সমস্ত ফরমানই কোনো আলেম বা দরবেশকে প্রদত্ত জায়গীর বিষয়ক অথবা কোন বিদ্বান ব্যক্তির জীবিকার জন্য সাহায্য স্বরূপ ছিল। অলিপুর গ্রামেও আমরা অনুরূপ ফরমানের কথা জেনেছি। এখানে একটি ইসলামী শিক্ষালয় ছিলো। সৈয়দ দাইমউদ্দিন মোল্লা শুধু শাহী মসজিদের মোতোয়াল্লী ছিলেন না, তিনি ইহতিসাব বিভাগের প্রধান অর্থাৎ মুহতাসিব ছিলেন। অলিপুর গ্রামের শাহী মসজিদ কমিটির নিকট রক্ষিত ফরমান লেখকের পিতৃব্য ১৯৬৫ সনে প্রত্নতত্ত বিভাগে হস্তান্তর করেছিলেন। পাকিস্তান প্রত্নতত্ত বিভাগের উপপরিচালক আমজাদ হোসেন অলিপুর গ্রামে এসে স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন।

(৬) আকবর নিজ রাজত্ব যেভাবে রাঙাতে আরম্ভ করেছিলেন এবং যার চিহ্ন শাহজাহানের কাল পর্যন্ত চলে আসছিল তা যদি অব্যাহত থাকতো তাহলে মোগল আমলে হিন্দুস্তান ইসলামী রাজ্য না হয়ে হিন্দুরাজ্যে পরিণত হতো। দেশ থেকে ইসলামী চিহ্নসমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল। রাজদরবারের পোশাক-পরিচ্ছদ হিন্দু ভাবাপন্ন হিন্দুয়ানী পাগড়ি এবং হিন্দুরাজাদের ন্যায় বাদশাহগণ অলঙ্কারও পরিধান করতেন। দরবারে সালামের পরিবর্তে সিজদা বা ভূমি চুম্বন প্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলিম পন্ডিতদের মাথায় টিকি পর্যন্ত রাখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ আত্মহনন এতদুর পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, অনেক আত্মমর্যাদাহীন মুসলমান হিন্দুদের সাথে নিজেদের কন্যার বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত শুরু করেছিল। আওরঙ্গজেব শাসনভার গ্রহণ করে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে এগুলো পরিবর্তন করেন এবং এদেশে ইসলামী রুসম-রেওয়াজ ও আইন-কানুন প্রবর্তন করেন। হিন্দু মুসলিম বিয়ের পূর্বে ধর্মান্তর করণ আব্যশিক করেন। তিনি হিন্দুদের জন্যে পূর্ণ নিরপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করেন। সেনাবাহিনীতে যোগদান মুসলিমদের জন্যে আব্যশিক ও হিন্দুদের জন্যে ঐচ্ছিক করেন। সামরিক বাহিনীতে যোগ না দেওয়ার জন্যে জিজিয়া করের ব্যবস্থা করেন। হিন্দুরা জিজিয়াকর প্রদান করে, সাময়িক বাহিনীতে যোগদান থেকে অব্যাহতি পায়।

(৭) তিনি ইহ্তিসাব বিভাগের প্রবর্তন করেন। এ বিভাগে যারা কাজ করতেন, তাদেরকে মুহতাসিব বলা হতো। প্রত্যেক জেলায় এ বিভাগে লোক নিযুক্ত করেন। তাদের কর্তব্য ছিল সাধারণের মধ্যে সৎ কাজের প্রচলন করা এবং সর্বপ্রকার অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। মোল্লা অজীহ উদ্দীন ছিলেন এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। অলিপুরে আমরা মোল্লা দাইমউদ্দিনের কথা জেনেছি, তিনি শাহী মসজিদের মোতায়াল্লী ও টোরা পরগনার মুহতাসিব ছিলেন। মোল্লা দাইমউদ্দিনের শেষ অধ্বস্তন পুরুষ বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকে মৃত্যু বরণ করেন। ফলে তার পরিবারের কোন সদস্যকে জীবিত পাওয়া যায়নি। মোল্লা বাড়িতে বর্তমানে যারা বসবাস করেন তারা মোল্লা ফাইম উদ্দিনের বংশধর নন। মোলত্মা বংশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(৮) সমস্ত রাজ্যে যতগুলো মসজিদ ছিল সবগুলোতে ইমাম, মুয়ায্যিন ও খতীব বা বক্তা নিযুক্ত করেছিলেন বাদশা আলমগীর রাজকোষ থেকে তাদেরকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অলিপুর আলমগিরি মসজিদের জন্যে এরূপ ব্যবস্থা ছিলো। যা প্রবন্ধে ইতিপূর্বে আলাপ করা হয়েছে। নারায়নপুর, ফিরোজপুর মসজিদ পরিভ্রমণ কালে লেখক বাদশাহ আলমগীর কর্তৃক ওয়াকফ করা ভূমির কথা জেনেছেন, যা আজ পর্যন্ত বর্তমান আছে।

(৯) ইসলামের জন্য তিনি সপ্তদশ শতকে সব চাইতে বড় যে কাজটি করেন তা হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী ফিক্হা বা মুসলিম জীবন-বিধানের ব্যাপারে যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর মীমাংসা করে দেন। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ফিক্হ্ শাস্ত্রের সংখ্যা সে সময় কম ছিল না। বাদশা বিভিন্ন দেশের তৎকালীন বড় বড় আলেম, ফকীহ্ ও মুফতীগণকে দরবারে ডেকে নেন এবং যাতে সর্বসাধারণ বুঝতে পারে এরূপ একটি ফতোয়ার কিতাব লিখতে অনুরোধ করেন। অতঃপর এ বিষয়টি সম্পাদনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মোল্লা নিজাম এ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ কার্য সম্পাদনের জন্য শাহী গ্রন্থালয়, যাতে অসংখ্য গ্রন্থ ছিল, উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ক্রমাগত কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ হয়। 'ফিতোয়া-ই-আলমগিরী' নামে গ্রহন্থটি বিশ্ব জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। আরব ও তুর্কীরা একে 'ফতোয়া-ই-হিন্দিয়া' বলে থাকে। মাআসিরে আলমগিরীর বর্ণনা মতে, এ গ্রন্থ প্রণয়নে তৎকালীন দু'লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য ফিক্হ গ্রন্থে যে সব মাসআলা অত্যন্ত জটিলভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা এতে নিতান্ত সহজ-সরল শব্দের মাধ্যমে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ সাথে নতুন সমস্যাগুলোর যুগোপযোগী ও সহজ সমাধান দেওয়া

হয়েছে। হিন্দুস্তানের তৎকালীন কাযীগণের আদালতের এটিই ছিল প্রধান আইন গ্রন্থ। ফতোয়ায়ে আলমগিরী , আরব জাহানের বাহিরে রচিত সবচাইতে মুল্যবান ও সমৃদ্ধ ইসলামী গ্রন্থ।

(১০) শাহী দরবারে এমনভাবে গান-বাজনা হতো, যা কোন ধর্মপ্রান ব্যক্তির জন্য অসহনীয় ছিল। গান-বাজনা দরবারের একান্ত করণীয় কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিল। শাহী দরবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাট্যশালায় পরিণত হয়ে যেতো। ইসলামী শরীয়ত এ ধরণের ব্যবস্থা কোন দিন অনুমোদন করেনি। আওরঙ্গজেব এ প্রথা বন্ধ করে দেন। লোকেরা সঙ্গীতের কৃত্রিম শব বানিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। বাদশাহ দেখে বলেন, "হ্যাঁ, ভালই করেছে। তবে এমনভাবে দাফন করবে যেন আবার কখনও বেঁচে না ওঠে।" আলমগীর গজল, হামদ,নাতের বিরোধী ছিলেন না। অশ্লীল গানি নৃত্য যা ইসলাম অনুমোদন করে নাসেগুলো আওরঙ্গা জেব বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

(১১) দরবারের সমস্ত জাঁক-জমক ও জৌলুস বন্ধ করে দেন। এমন কি রূপোর দোয়াতের পরিবর্তে চীনামাটির দোয়াত ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। উপঢৌকনাদি রূপোর থালার পরিবর্তে সাধারণ পাত্রে আনার হুকুম দেন। বাদশাহ বিনা কারণে উপঢৌকনাদির প্রদান বন্ধ করেছেন। রাজকীয় অর্থে শরাব ক্রয় ও পরিবেশ নিষিদ্ধ করেন।

(১২) আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সবচেয়ে বড় সংস্কারমূলক কাজ যা ইসলাম এবং খেলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা হচ্ছে প্রজাদের 'হক' আদায়। পূর্বকালে কোন প্রজা রাজার বিরুদ্ধে কিছু দাবি করলে তার কথা শোনার কোন লোক থাকতো না। সে রাজশক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করে উঠতে পারতো না। দুনিয়ার কোথাও এ সম্পর্কিত কোন আইন বা নিয়ম ছিল না। বাদশাহ আওরঙ্গজেব ১০৮২ হিজরীতে এক ফরমান জারি করেন যে, প্রত্যেক জেলায় সরকারী উকিল নিযুক্ত করা হবে এবং সাধারণ লোকের কাছে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে যে, বাদশাহ্‌র ওপর যদি কারো কোন দাবি থাকে তবে সরকারী উকিলের কাছে তা পেশ করতে পারবে। তার হক প্রমাণিত হলে সরকারী উকিলের কাছ থেকে তা আদায় করে নিতে পারবে। (দ্রষ্টব্য ঃ খাফী খাঁ - ৪৯) আরঙ্গজেব যদিও মোগল রাজবংশে জন্মে ছিলেন, মন মানসিকতায় তিনি সম্পূর্ণ মুসলিম ছিলেন। সাধারণ জীবন যাপন করে নিজেকে অসাধারণ করে তুলে ছিলেন। একজন উৎকৃষ্ট মুসলিম রূপে তিনি তার সাম্রাজ্য শাসন করে গেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত না হয়েও একজন সত্যিকার প্রজা হিতোষী বাদশাহ রূপে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার মুসলমানরা সম্ভবত এই প্রথমবার যথার্থ ইসলামী শাসনের সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং ইসলামী শাসনের সুফল ভোগ করেছিল। আওরঙ্গজেব দিল্লী থেকে শাসন করলেও এবং বিভিন্ন সময় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে রাজধানী থেকে অনুপস্থিত থাকলেও রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও তাঁর কর্ণগোচর হতো। এ জন্য তিনি 'ওয়াকেয়া নিগারী' নামক একটি পৃথক দায়িত্বশীল বিভাগ কাযেম করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও ছোট-বড় সকল প্রশাসকের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকতো। তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তাগণ যাতে কোনো প্রকার ইসলাম বিরোধী কাজ এবং এমন কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে না পারে, যাতে মুসলমানদের ইসলামী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে না পারে, সেদিকে তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। একবার তিনি জানতে পারলেন যে, বাংলার সুবাদার শাহজাদা আজিমুশ্‌শান হিন্দুদের 'হোলি' উৎসবে জাফরানি রং-এর লাল বস্ত্র পরিধান করেছেন। তিনি বিরক্ত হয়ে শাহজাদাকে পত্র লিখলেন ঃ "তোমার মস্তকে জাফরানি রং-এর শিরস্ত্রাণ, কাঁধে লাল কাপড় -(অথচ) তুমি ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক প্রবীণ - তোমার দাড়ি ও গোঁফের জয় হোক।" আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর প্রথা পুনঃ প্রবর্তন করেন এ জন্যে হিন্দু সমাজ তার বিরোধী হয়ে ওঠে একথা সত্যি তবে এর

কারণ ভারতে মুসলিম শাসন রক্ষা পেয়েছিলেন। ভারত বর্ষে শুধু নয় পৃথিবীর ইতিহাসে খাঁটি মুসলমান হিসেব ক্ষণজন্মা কিছু মানুষের মাঝে তিনি অন্যতম। চাঁদপুর অঞ্চলে তার শাসন আমলে নির্মিত মসজিদ সমূহ প্রমান করে, সে সময়ের যমুনার ঢেউ মেঘনা পাড়েও সঠিক ভাবে এবং চমৎকার ভাবে আছড়ে পড়েছিলো। আওরঙ্গজেবের দুরদর্শিতার কারণে তার মৃত্যুর সাড়ে তিনশত বছর পরও ইসলাম ও মুসলমানরা এখনো ভারত বর্ষের মাটিতে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আজ ২০০৫ সালে যখন সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের দুর্দিন, পৃথিবীর তাবৎ জাতিসমূহ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে একট্টা হয়েছে, ধর্ষিত মুসলিম নারীর আর্তনাদ আল্লাহর আরশ ছুঁয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা বাদশাহ আলমগীরকে তীব্রভাবে অনুভব করছি। আমরা স্মরণ করছি ইসলাম জিন্দা হোত হ্যাঁয় হায় কারবাল কি বাদ' বাক্যটিকে।

আওরঙ্গজেবের আমলের বাংলার দেওয়ান ও পরবতীকালের সুবাদার মুরশিদ কুলি খাঁর শাসনকালের কার্যাবলী আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সেখানে আমরা এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, বাংলার শাসনকর্তাদের মধ্যে একমাত্র তাঁর আমলে মুসলমানরা ইসলামী শাসন ও ইসলামী চরিত্রের সাথে কিছুটা পরিচিত হয়েছিলো, বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতি একটা পৃথক চেহারা নিতে শুরু করেছিল। অমুসলিমদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা করার জন্য মুসলমানরা মাথায় টুপি পরতো। হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের মতো মাথায় বড় বড় চুল রাখতো না। বরং মাথায় চুল ছাঁটতো এবং দাড়ি রাখতো। আর তারা ধুতি ছেড়ে ইজার বা ঢোলা পাজামা পরতো। ধুতির পরিবর্তে তহবন্ধ অর্থাৎ লুঙ্গির প্রচলন ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছিল। ঈদ উৎসবসহ বিভিন্ন মুসলিম ধর্মীয় উৎসব সমূহ সে সময় বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

শবে বরাত, রোজা, ঈদ অন্যান্য মুসলিম উৎসব সমূহ বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে সার্বজনীন পরিচিতি পেয়েছিলো এভাবে মুসলমানরা একদিকে ইবাদত-বন্দেগীতে এবং অন্যদিকে চেহারা-সুরতে স্থানীয় অমুসলিম সমাজ থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র করে নিয়েছিল। আলাদাভাবে পরিচিত হতে পেরেছিল। পঞ্চাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মুসলমান সমাজে যে বিপর্যয় এগিয়ে চলছিল যরথুস্ট্রীয়, বৈরাগ্যবাদী ও বেদান্ত দর্শন প্রভাবিত এক শ্রেণীর সুফীদের ভ্রান্ত মতবাদ ও পদ্ধতিই তার জন্যে দায়ী। এ সময় উপমহাদেশের কেন্দ্রবিন্দুতে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশের হৃদয়েও তার কম্পন অনুভূত হয়েছিল। আর সেই কম্পনের কারনেই বাংলায় ইসলাম সুদৃঢ় রূপে তার অবস্থান ধরে রেখেছে। চাঁদপুর অঞ্চলে ইসলামের শেকড় পাকাপোক্তভাবে গেঁথে আছে। আজো এ জেলার সহস্রধিক গ্রামে মুসলিম সংস্কৃতির লালন পালন হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে। ইংরেজ শাসন আমলের একশত নব্বই বছরের লজ্জা অপমান আর অবহেলাকে ঝেড়ে ফেলে মুসলিম সম্প্রদায় আবার বাংলাদেশের আদলে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। সেদিন হয়তো বেশি দুরে নয় যে দিন সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের স্বর্ণযুগ আবার ফিরে আসবে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব ও চাঁদপুর ঃ

সপ্তাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে বাংলাদেশে চলছিল চরম রাজনৈতিক গোলযোগ। নবাব আলীবর্দী একদিকে মারাঠা বর্গীদের সাথে লড়াই করছেন। আবার অন্যদিকে রোহিলাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হচ্ছে। এভাবে মারাঠাদের দমন করতেই তাঁর প্রাণান্ত হলো। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বেশী দিন বাংলার মসনদে টিকে থাকতে পারলেন না। বাণিজ্য ব্যাপদেশে আগত ইউরোপের কতিপয় খৃস্টান জাতি বহুদিন থেকে ভারতের সিংহাসনের দিকে লোলুপদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে তারা দিল্লীর দরবারে প্রবেশ করে।

অতঃপর বাদশাহর কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করে। পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল এবং সেখান থেকে বাংলার উপকূলে প্রবেশ করে। মাত্র এক'শ বছরের মধ্যে নিজেদেরকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। ইউরোপ থেকে আগত পর্তুগীজ, ফরাসী ওলন্দাজ ও ইংরেজ এ চারটি খৃস্টান জাতির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই নিজেদেরকে শক্তিশালী প্রমাণ করে। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও তারা এদেশে ব্যাপকভাবে খৃস্টধর্মের প্রচারও চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা বাংলাদেশে পদার্পণ করেই হিন্দুদের মনোভাব উপলব্ধি করতে পারে। হিন্দুদেরকে নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে। হিন্দুরা মুসলমান সমাজকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করলেও পাঁচ'শ সাড়ে পাচ'শ বছরের মধ্যেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে দিতে সক্ষম হয়নি। তারা মুসলমানদের শাসনকে এদেশীয়দের শাসন মনে করছিল না। তাই মুসলিম শাসন থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করছিল। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দে মুসলিম শিবির দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। মীর জাফরের নেতৃত্বে নবাব পরিবারের একটি অংশ ক্ষমতার লোভে হিন্দু ও ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল।

ক্ষমতার মধ্যমনি ইংরেজরা এ সুযোগ হাতছাড়া করলো না। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে সিরাজ-উদ-দৌলা নিহত ও ইংরেজদের হাতের পুতুল পরবর্তী নবাবদের কারণে শাসক মুসলিম জনগোষ্ঠী ইংরেজ বেনিয়া ও স্বদেশী হিন্দুদের নিগ্রহের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর পলাশী যুদ্ধের ঢেউ চাঁদপুর অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছিলো। ভাগীরথীর রক্ত স্রোত মেঘনা ছাড়িয়ে ডাকাতিয়া নদীর তীরে উপস্থিত হলো। অবশ্য পলাশী যুদ্ধের পূর্বেই চাঁদপুর অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় এক দেশীয় শাসকের কারণে আগ্রাসী হয়ে উঠেছিলো। নাসির কোর্ট তার প্রমাণ। হাজীগঞ্জ থানা সদর হতে প্রায় দশ মাইল উত্তর পশ্চিমে নাসির কোর্ট গ্রামের অবস্থান। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় কচুয়া থানার আলিয়ারা ক্ষত্রিয় রাজা অযোধ্যারাম ছেন্দা নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাকে দমনের জন্য সেনাপতি নাসিরখানকে চাঁদপুর অঞ্চলে প্রেরণ করেন। নাসিরখান এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

যুদ্ধে ছেন্দা পরাজিত ও নিহত হয়। কোর্ট অর্থ দুর্গ। তাই নাসিরখানের দুর্গের জন্যই এ গ্রামের নাম হয় নাসিরকোর্ট।

লোহা গড়ের জমিদারদের উত্থানও এ সময়ই। বেনিয়া ইংরেজ ও নবউত্থিত হিন্দুশক্তি ২৩ জুন ১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভ করে। ইংরেজরা এ দেশে তাদের শোষণ শাসনকে স্থায়ী রূপ দিতে সমর্থ হয়। সাড়ে পাঁচশত বছরের মুসলিম সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক প্রজা হিন্দুরা ইংরেজ বিনিয়াদের দোসর হিসেবে বাংলার ইতিহাসে আর্বিভূত হয়। শুরু হয় লুট পাটের এক অন্তহীন খেলা। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ বল্লভের সহযোগী এক নিম্ন স্তরের রাজকর্মচারী নবাবের তহবীল তসরূপ করে ফরিদগঞ্জের নদী কবলিত গ্রাম এলাকায় পালিয়ে আসেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন লোহাগড় জমিদার বাড়ির। এখনও লোহাগড়ে ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে অত্যাচারী জমিদারদের দুই শত পঞ্চাশ বছরের পুরাতন তিনটি মঠ রয়েছে। রয়েছে ভগ্নপ্রায় ৪টি দ্বিতল, তৃীতল ভবন। নব ইংরেজ রাজশক্তির নিকট থেকে লুঠের অর্থ দিয়ে জমিদারী ক্রয় করে, প্রজাদের ওপর নির্মম অত্যাচারের কুখ্যাতি অর্জন করে তারা। তাদের অত্যাচারের কাহিনী এতই নির্মম ছিলো যা এখনো ভয়াবহ জনশ্রুতি হিসেবে বর্তমান। কোন কোন জ্ঞানহীন মানুষ লোহগড়ে মঠ গুলোকে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশহিসেবে মাঝে মধ্যে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস যা সত্যিকার অর্থে নিন্দনীয় পায়। লোহগড় আমাদের ঐতিহ্য নয় বরঞ্চ কলংকের স্বাক্ষর।

১৮১২ সালে ঢাকার নবাবদের দানে প্রতিষ্ঠিত হয় চাঁদপুর শহরের প্রথম মসজিদ 'বেগম মসজিদ'। হাজিগঞ্জের লক্ষ্মি নারায়ন জিউর আখড়া স্থাপিত হয় ১৮৭৮ খ্রিঃ। চাঁদপুর কালিবাড়ী স্থাপিত হয় ১৮৮৩ খ্রিঃ। ১৮৮৫ সালে আসাম - বেঙ্গল রেলপথের চাঁদপুর শাখা নির্মিত হয়। পরে আই-জি-আর-এস-এন-কোম্পানীর ষ্টীমার ঘাট স্থাপিত হয়। এগুলোর সাথে ঐতিহ্যের কোন আবরণ না থাকলেও ইংরেজ আমলের ভালো কীর্তি হিসাবে বিবেচিত। চাঁদপুরে নীল বিদ্রোহের একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। জি,পি, ওয়াাইজ সাহেব মেঘনা তীরবর্তী, দুলালপুর, ব্রাহ্মণচর, মাছিমপুর, ভরঞ্জাগাছচর অফিস চিতোষী, গ্রাম গুলিতে কুঠি স্থাপন করে নীল চাষ শুরু করেছিলন। ১৮৬৬ সনে এই নীল চাষের পূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু নীল চাষীদের দুর্দান্ত প্রতিরোধের মুখে ১৮৭৩ খ্রিঃ এই অঞ্চল থেকে নীল চাষ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। বেশীর ভাগ নীল কুঠি এখন মেঘনা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

তবে ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহেব বাজারের নীল কুঠি এখনও বর্তমান। এটি নীলকুঠি হিসেবে নির্মিত নয়। এটি নির্মিত হয়েছে এসব নীলকুঠি স্থাপনের তিনশত বৎসর পূর্বে (১৫৪০ খ্রীঃ) পর্তুগীজ সেনাপতি অ্যানতোনিও ডি সিলভা মেনজিস কর্তৃক। ইতিহাস থেকে যতদুর জানা যায় অ্যানতোনিও ডি সিলভা ১৫৪০-১৫৪৬ এর মধ্যে দুর্গটি নিমার্ণ করেন শের শাহের আমলে পাঠান সেনাপতি খিজির খানের সাথে সাহেবগঞ্জ এলাকায় যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে ছিলো। পর্তুগীজদের খিজিরখান এ অঞ্চল থেকে বিতারিড়ত করেন। সাহেবগঞ্জ এলাকায় বর্তমানে চার, পাঁচটি পর্তুগীজ বংশধরদের বাড়ি আছে। দুর্গ নিমার্ণের তিনশত বছর পর, পুর্তগীজ সেনাপতির বংশধররা কিছুদিন দুর্গটিকে নীল কুঠি হিসেবে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে দুর্গটি প্রায় ধ্বংশ প্রাপ্ত। ধ্বংশ স্তপের মাঝেও কিছু কিছু স্থাপনা এখনও টিকে আছে , স্থাপনাগুলো আজো এ দেশবাসীর প্রতি পর্তুগীজ দস্যুদের ভয়াবহ এবং নির্মম অত্যাচারের স্বাক্ষ্য দিচ্ছে। পতুগীজ সেনাদের অধ্বস্তন প্রজন্মের প্রতিনিধি ষ্ট্যানলি -ডি-সিলভা ও পল-ডি-সিলভার সাথে লেখকের আলাপ হয়েছে। ওর গর্বের সাথে এখনো উচ্চারণ করে ওরা ইউরোপীয় ছিলো। লেখক ইতিহাস ঐতিহ্যের সন্ধানে বহুবার সাহেবগঞ্জ ভ্রমণ করেছেন।পর্তুগীজ হার্মাদদের অত্যাচারের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বাংলা বাঙ্গালীর অনেক করুন ইতিহাস তাই দুর্গটি সংরক্ষণ করা দরকার।

হাজীগঞ্জ উপজেলা সদরের অদূরে আলীগঞ্জ। এখানে একটি মসজিদ আছে যেটি একজন দরবেশের নামে স্থাপিত। মাদখাঁ মসজিদ জনশ্রুতি রয়েছে শাহ মর্দান খান হজরত শাহ জালালের সাথী ছিলেন। অলিপুর সুজা মসজিদ নির্মাণের অর্ধশত বছরপর এটি নির্মিত হয়। নির্মাণ সাল ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। এরও প্রায় সোয়া চারশত বছর পূর্বে সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্ব কালে (১৩০১-১৩২২) চাঁদপুর সদর উপজেলার শাহতলী গ্রামে একজন ধর্মপ্রাণ শাসকের আগমন ঘটে। তিনি বাগদাদ থেকে এ দেশে আসেন তার নাম হযরত শাহ্ মাহমুদ বোগদাদী যার নামানুযায়ী শাহাতলী গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে। বাবুরহাটের কাছে মৈশাদী ইউনিয়নের অন্তর্গত শিলন্দিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে একটি অত্যান্ত সুন্দর দিঘী আছে গোলাবাড়ি দিঘী। দিঘীর পশ্চিম দক্ষিণ কোনে একটি এক গম্বুজ মসজিদ ছিলো, যা দশ/ বার বছর পূর্বে স্থানীয় জনগণ ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করেছেন। পুনঃ নির্মাণকালে অজ্ঞতা বশতঃ জনগণ সম্পূর্ণ প্রত্নসম্পদটি নষ্ট করে ফেলেছে। মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে পুরাতন স্থাপনার কিছু ইট স্তুপ করে রাখা আছে। মসজিদের পার্শ্বে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে চার জন মানুষের ইটে বাঁধানো সমাধি যা শত শত বছরের পুরানো। বর্তশানে শিলন্দিয়া গ্রামের সকল অধিবাসী অস্থানীয় ও নবাগত। শিলন্দিয়া গ্রামের গোলাবাড়ি দিঘী সম্বন্ধে বা মসজিদ সম্বন্ধে তাদের কোনই ধারণা নেই। গ্রামবাসি এখনও গায়েবী মসজিদ বলে নতুন মসজিদটির পরিচয় দান করে। পূর্বতন মসজিদটি মাটির নিজ থেকে উঠেছে বলে স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস। জনশ্রুতি মসজিদটিতে নামাজ আদায় করলে অনেক ফজিলত হয়। হজরত শাহ মাহমুদ বোগদাদীর সাথে আরো তিনজন আওলিয়া শাহতলী গ্রামে এসেছিলেন যাদের মাযার এখনো সংরক্ষিত আছে।

শাহরাস্তি উপজেলা চাঁদপুর জেলার সর্বপূর্ব অংশে অবস্থিত। এই উপজেলার রায়শ্রী (দঃ) ইউনিয়নের নরহ গ্রাম এর পূর্ব পার্শ্বে ডাকতিয়া নদীর কোলঘেষে রয়েছে একটি প্রকান্ড দিঘী, নাটেশ্বর দিঘী নামে এটি বহুল পরিচিত। ২৯ একর জমি নিয়ে দিঘীটি খনন করা হয়েছে। দিঘীর পাড় গুলো পাহাড়ের মত উচু। পূর্ব পাড়ের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ত্রিশফুট উচুঁ পাড়ের ওপর নির্মিত ভুমিতে শুয়ে আছেন একজন অলী হযরত শাহ শরীফ বোগদাদী, ইনি হযরত রাস্তি সাহেবের আধ্যাত্মিক গুরু। নাটেশ্বর রায়ের দিঘীর পূর্ব পাড়ের উত্তর কোনে একটি অতীব সুন্দর তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। মসজিদটির মেহেরাবের ওপর একটি এবং প্রবেশ মুখে প্রধান দরজার ওপর একটি করে আরবি ভাষায় লিখিত দু'টি শিলালিপি রয়েছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় মসজিদটি নয় বৎসর কাল সময় নিয়ে নির্মাণ করা হযেছিলো। হায়াতে আব্দুল করিম নামে নাটেশ্বর রায়ের এক কোতোয়াল এটি নির্মাণ করে ছিলেন এবং এই মসজিদ নির্মাণের সম্পূর্ণ অর্থ হায়াতে আব্দুল করিমের কষ্টার্জিত শ্রমের অর্থ থেকে ব্যয়িত। মসজিদটির নির্মাণ কাল ১৩৯৭ -১৪০৬। এ সময়ে বাংলার শাসক ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১)। হযরত শাহ জালাল ১৩০৩ সালে সিলেট জয় করেন তার সাথে ৩৬০ জন আওলিয়া যারা যোদ্ধাও ছিলেন সিলেটে আগমন করেন।

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৫০) শাসন আমলে ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম সফরে আসেন এবং হযরত শাহ জালালের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে নৌকা যোগে এক মাসের পথ অতিক্রম করে কামরূপ গমন করেন। সিলেটে তখন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিলো। শাহ জালালের আস্তানায় ইবনে বতুতা কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি বলেন ''শাহজালাল লম্বা ও পাতলা গড়নের ছিলেন। তাঁর দু' দিকের গাল বসা, এক'শ পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলতেন, তিনি বাগদাদের খলিফা মু'তাসাম বিল্লাহকে দেখেছেন। খলিফাকে হত্যা করার সময় তিনি সেখানে ছিলেন'' হজরত শাহ জালালের সাথী ৩৬০ জন আওলিয়া সবাই সম বয়সের ছিলেন না। হজরত শাহজালাল কত বৎসর বয়সে সিলেট এসেছিলেন তা জানা যায়নি। তবে ১৩০৩ সালে যুদ্ধের সময় তার বয়স ১০৩ বছর ছিলো। অনেকে বলে থাকেন হজরত রাস্তি শাহ্ ও হজরত শাহ শরীফ বোগদাদী হজরত শাহ্ জালালের

সাথী ছিলেন। সিলেটের যুদ্ধ হয়ে ছিলো ১৩০৩ সালে। শরীফপুর মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল ১৩৯৭-১৪০৬ সালের মধ্যে। হজরত শাহজালালের জীবিত থাকার সময়ে হজরত রাস্তি শাহ তাঁর সাথী ছিলেন একথা ইতিহাস স্বীকৃত। হজরত শাহজালাল (১১৯৭-১৩৪৭) ১৫০ বছর বেঁচে ছিলেন।

ইবনে বতুতার বর্নণা অনুযায়ী হযরত শরফ উদ্দিন বোগদাদী ও হযরত রাস্তি শাহ্ হযরত শাহ জালালের সাথী হওয়ায় পেছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সিলেট বিজয় ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সময় চাঁদপুর অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম বিকশিত হয়ে ছিলো। রাস্তিশাহ ও হযরত শাহ্ শরীফ বোগদাদী সিলেটে গৌরগবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ছিলেন কিনা তা আজ জানার উপায় নেই। তবে কোন কোন ইসলামী চিন্ত াবিদের বইতে রাস্তি শাহ্ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। চাঁদপুর জেলার শাহাতলী গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হজরত শাহমাহমুদ বোগদাদী সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহের সময় (১৩০১ - ১৩২২) শাহতলীতে আসেন। তখন সিলেট অঞ্চলে গৌর গোবিন্দের সাথে হজরত শাহ জালালের যুদ্ধ হয়েছিলো।

হাজীগঞ্জ থানার ফিরোজপুর গ্রামের ফৌজদার ফিরোজ খান দেওয়ান কর্তৃক স্থাপিত মসজিদ ও নাটেশ্বর দিঘীর পাড়ের হযরত হায়াতে আব্দুল করিমের অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদ প্রমাণ করে চাঁদপুর জেলা একটি প্রাচীন জনপদের সমৃদ্ধ অংশ ছিলো। চাঁদপুর জেলা সম্পূর্ণ নদী মাতৃক হওয়ার সুবাধে এখানে নৌ-বাণিজ্য যতেষ্ট উন্নতি করেছিলো। ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে জনসাধারণ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিলো। ঐতিহ্যগতভাবে চাঁদপুর অঞ্চলে সহস্র বছর ধরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই শান্ত ছিলো ফলে এক সময় এখানে ব্যবসা বাণিজ্য খুবই প্রসার লাভ করে ছিলো। মুসলিম বিজেতা বা শাসক শ্রেণীর পূর্বেই চাঁদপুর অঞ্চলে সুফী সাধকরা এসেছিলেন।

এ অঞ্চলে সাত শতাধীক বছর পূর্বেই, সুদৃঢ় কাঠামোর ওপর একটি অত্যন্ত কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্তমান ছিলো প্রায় প্রত্যেকটি মসজিদের পাশেই একটি করে দিঘী খনন করা হয়েছিলো। এই সব দিঘীর পাড়গুলো উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছিলো। ধারণা করা হয় নিম্নভূমি হওয়ার কারণে সমুদ্রের নোনা পানির জলোচ্ছাস থেকে সুপেয় পানির আধারকে রক্ষা করার জন্য দিঘীর পাড় গুলো উচো করে নির্মাণ করা হয়েছিলো। চওড়া দিঘীর পাড় সমূহে সৈন্যদের ব্যারাক ও প্রশাসনিক দপ্তর ছিলো। গ্রাম, মৌজা, পরগনা নামে প্রশাসনিক স্তর ছিলো। ফৌজদার, কোতোয়াল, তহশীলদার, দেওয়ান, নায়েব নামের রাজ কর্মচারীগণ ছিলেন।

কচুয়ার উজানী গ্রামে একটি এক গম্বুজ মসজিদ আছে এ মসজিদটির কথা এই লেখার প্রথম দিকে খানিক বর্ণনা করা হয়েছে। উজানীর পুরানো নাম উজানী নগর । এক সময় মেঘনার শাখা নদীর তীরে ছিলো এই উজানী নগর। বেহুলার পিতার রাজত্ব ছিলো উজানী নগরে এখানে বেহুলার দিঘী বলে একটি প্রকান্ড দিঘী আছে। চাঁদ সওদাগর যমুনা, করতোয়া, পদ্মা ও অন্য চারটি বড় নদী পাড়ি দিয়ে এই উজানী নগরে তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর ভিড়িয়ে ছিলেন। আজো উজানীতে বেহুলার শিলপাটা ও নুড়ি ররেছে। এখানে মসজীদে একটি শিলা লিপি পাওয়া গেছে যা পাশী ভাষায় লিখিত। ''ইলিয়াস খানের পুত্র হোসাইন খান তার পুত্র বখতিয়ার খান ফৌজদার কর্তৃক ১১১৭ হিজরী সনে সুবে বাংলার ''ধরলাই'' পরগনায় ভারত সম্রাট গাজী বাহাদুর শাহের রাজত্ব কালে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজীদের আয়তন ২১-০´ × ২৩-০´ এক গম্বুজ বিশিষ্ট। ''এর মেহেরাব আবুবকর ওমর, ওসমান, আলীর অনুসারীদের জন্যে।'' আমরা একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি ফাসীতে লেখা শিলালিপি সম্বলিত সব গুলো মসজিদই মোগল আমলের এবং প্রতিটি শিলালিপিতে ''চারজনের অনুসারী'' অর্থাৎ সুন্নী মুসলীমদের জন্যে লেখা আছে। ঐতেহাসিকগণ

মনে করেন মোগল শাসক বৃন্দ সুন্নী মতালম্বী ছিলেন। সে সময়ে শিয়া সুন্নী মতবাদের মধ্যে প্রবল বিরোধীতা ছিলো।

তবে সে আমলে বাংলায় শিয়া মুসলীমরাও সংখ্যার কম ছিলো না। শিয়া- সুন্নীর মাঝে যে সম্প্রদায় গত বিরোধ ছিলো তা সুবে বাংলায় ও স্পষ্ট ছিলো। সম্রাট শাহাজাহানের সময়ে কচুয়া উপজেলার দারাশাহী তুলপাই নামক গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সেটির বিষয় ও রচনার প্রথম দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। স্থানীয় মোগল ফৌজদার সম্রাট শাজাহানের প্রিয় পুত্র দারাশিকোর নামে গ্রামটির নামকরণ ও একটি এক গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। এখানে একটি মাযার আছে লোকজন দারা শাহেব মাযার বলে। অনুরূপ একটি মসজিদ পালগিরি গ্রামেও রয়েছে। এবার আলোচনায় আসবো চাঁদপুরের অপর বৃহৎ ধর্মমতের অনুসারী হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষগণ কর্তৃক নির্মিত প্রত্ন সম্পদগুলোর বিবরণ নিয়ে বাবুরহাটের মঠটির বয়স দেড়শত বছর। লোহগড়ের তিনটি মঠের বয়স আড়াইশত বছর নাওড়ার মঠের বয়স দেড়শত বছর এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্য স্থাপনা সমূহ প্রায় সবই ইংরেজ রাজত্ব কালে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসকদের শাসন আর দুইশত বছর ইংরেজদের শাসন মোট সাত বছরের কোন পর্যায়েই এখানে স্বাধীন হিন্দু শাসকের উদ্ভব হয়নি। বাংলা বা বাঙ্গালীর শাসন বলতে মুসলিম শাসকদের রাজত্ব কালকেই বুঝায়। বিগত সহস্রাব্দে অর্থাৎ পাল বংশের রাজত্ব কালের পর থেকে, এই বাংলায় সত্যিকার অর্থে কোন বাঙালী বংশদ্ভুত শাসক বাংলা শাসন করেন নি। সেন বংশের রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন না। তারা কর্নটাকের বাসিন্দা ছিলেন। বাংলার অসাম্প্রদায়িক ও সুষ্ঠ সামাজিক অবয়বে তারা তথাকথিত কৌলিন্য বা জাতি ভেদ প্রথা চালু করেছিলেন। যা তিন সহস্র বছরের অধিক পুরানো হিন্দু ধর্ম মতকে এই শ্রেণী ভেদ প্রথা দুর্বল করে দিয়েছে। চাঁদপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে লেখক হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ব প্রজন্ম কর্তৃক স্থাপনকৃত প্রত্নসম্পদের অন্বেষায় খোঁজ খবর নিয়েছেন, তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। তবে মেহার অঞ্চলে দাস রাজ বংশে নামে একটি পুরাতন রাজ পরিবারের অস্তিত খুঁজে পাওয়া যায়।

চাঁদপুর অঞ্চলের আরেকটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি হচ্ছে কচুয়া উপজেলার ১২নং আশ্রাফপুর ইউনিয়নের চৌধুরী বাড়ির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট জামে মসজিদ। এই চৌধুরী বাড়িটি একটি হিন্দু জমিদার বাড়ি ছিলো, যেমন অলিপুর সুজা। মসজিদটি অলিপুর চৌধুরী বাড়িতে অবস্থিত। অলিপুর চৌধুরীরাও হিন্দু জমিদার ছিলেন পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আলমগীরি মসজিদটি যে বাড়িতে অবস্থিত সেটির বর্তমান নাম কালাঠাকুর বাড়ি। যদিও ঠাকুরদের কোন বংশধর কেহই এখন সে বাড়িতে নেই। যারা আছেন তারা মুসলিম তালুকদার উপাধি দারী এরা এসেছেন ডাকাতিয়া নদীর অপর পাড় থেকে মাত্র নব্বই বছর আগে। কালা ঠাকুর বাড়ির মসজিদের সম্মুখে একটি বেলে পাথরের তৈরী বিষ্ণুমূর্তি খচিত পুঁজোর বেদি আছে। মনে হয় ঠাকুর বাড়ির লোকজন এটি পুজোঁর কাজে ব্যবহার করতেন। এই বেদিটি ১৯৪৬ সনে একবার পার্শ্ববর্তী বলাখাল এলাকার কতিপয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক স্থানান্তর করেছিলো, পরে অলিপুর গ্রামের লোকজন এটি পূর্ব স্থানে ফেরত নিয়ে এসেছে। কালা ঠাকুর বাড়ির বর্তমান বাশিন্দারা বেদীটিকে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে।

সব ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটি সময়ে মসজিদ সম্বলিত প্রতিটি বাড়িতে মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের প্রশাসনিক দপ্তর ছিলো। মুসলমানদের পরে হিন্দু জমিদার শ্রেণী সে বাড়িগুলোতে বসবাস করেছেন। তারা মসজিদ গুলো ধ্বংশ না করলেও অনাবাদি ও অবহেলিত থাকার ফলে কালের চক্রান্তে গাছগাছালি ও মাটিতে ঢাকা পড়ে যায়। অপর দিকে চতুর্থদশ শতকে বাংলা সহ ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও ১৫০৫ সালে পশ্চিম উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ভূ প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটে চাঁদপুর সদর উপজেলার ছোট সুন্দর তালুকদার বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে একটি ধ্বংশ প্রাপ্ত স্থাপনা রয়েছে। স্থাপনাটি বয়স

কমপক্ষে চারশত বছরের অধিক, কিন্তু জানা নেই এটি কারা স্থাপন করেছে। বড় বড় নদী গুলোর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। নদীর স্রোত ধারা পরিবর্তনের ফলে শহর বন্দর ও নগরী সমুহের গুরুত্ব ও অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে যায়। নদী মাতৃক বাংলাদেশের অনেক নামী দামী বন্দর ও বানিজ্য কেন্দ্র তাদের গৌরব হারিয়ে একসময় সাধারণ লোকালয়ে পরিণত হয়। ছোট সুন্দর গ্রামের মসজিদটি খুবই ছোট এক গম্বুজ বিশিস্ট । ইমামের পেছনে মাত্র এককাতর মুসল্লী নামাজ আদায় করতে পারে।

আমরা যেসব মসজিদ গুলো পরিদর্শন করেছি প্রায় সব খানেই দেখেছি ধর্মান্তরীত বা বিশেষ কোন কারণে পরবতী সময়ে হিন্দু জমিদার শ্রেণী বিলীন হওয়ার পর নতুন আবাস স্থাপনকারী মুসলিম জনগণ মসজিদটি মাটির নিচ থেকে উঠেছে বা গায়েবী মসজিদ বলে অনুমান করে। যা পরবতী সময়ে জনশ্রুতিতে পরিণত হয়। প্রকৃতার্থে এই সব স্থাপনা সমুহ মুসলিম রাজন্যবর্গ নির্মাণ করেছিলেন। রাজকোষের অর্থ ব্যয় করে। এই মসজিদ গুলো তাদের নিয়োজিত রাজ কর্মচারী ও জন সাধারণের জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে। কোন মসজিদই মাটির নিচ থেকে গায়েবি ভাবে উঠে আসেনি। আশ্রাফপুর গ্রামে একসময় অজ্ঞাত এক রোগে, সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। বহুদিন পর ইংরেজ রাজত্বকালে এটি আবার নতুন করে আবাদ হয়, লোকজন বসতি স্থাপন করে। নতুন বাসিন্দারা জঙ্গাল কেটে দেখতে পায়, একটি মসজিদের তিনটি গম্বুজ।

মাটি সরানোর পর সম্পূর্ণ বসতি মসজিদটি উদ্ধার প্রাপ্ত হয় জনশ্রুতির ব্যাপারটি ঘটে আশ্রাফপুর মসজিদের বেলায়ও ঘটে। মসজিদটি এখন দশফুট উচু মাটির ঢিবির উপর দাড়িয়ে আছে। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে সে আমলে নির্মাণ করা একটি হুজরা খানা আছে। মুল মসজিদ ভবনের তিন পার্শ্বে ১৫ ফুট চওড়া খোলা চত্তর রয়েছে যা ইট সুরকি দ্বারা তৈরি। এক সময় মসজিদটি মাটিতে ঢাকা পড়ে ছিলো, শুধু তিনটি গম্বুজ ছাড়া। বর্তমানে আশ্রাফপুর চৌধুরী বাড়িতে বসবাস করছেন মুসলিম ধর্মালম্বন মজুমদার উপাধিধারী লোকজন যারা পার্শ্ববতী কালচোঁ গ্রাম থেকে এখানে এসেছেন। লেখক তার ছেলে রাজীব ও চাঁদপুর রঘুনাথপুরের বাসিন্দা আক্তারহোসেনকে সাথে নিয়ে ১৫ জুন/০৫ আশ্রাফপুর পরিদর্শন করেন। স্থানীয় বাসিন্দা আশি বছরের, বৃদ্ধ এয়াকুব আলী মজুমদার (৮৫) আব্দুল খালেক পাটওয়ারী (৭৮) এর সাথে আলাপ করেন। এই দু'টি পরিবার বর্তমানে মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তাদের পূর্ব পুরুষগণ দেড়শত বছর পুর্বে, ইংরেজ আমলে পার্শ্ববতী গ্রাম থেকে এখানে এসেছেন এবং ইংরেজ শাসকদের নিকট থেকে লীজ সুত্রে তারা জমি জোতের মালিক হয়েছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চাঁদপুর। লাকসাম রেলপথ তৈরী হওয়ার বিশ বছর পর এয়াকুব মজুমদারের, পূর্ব পুরুষ ভগ্নাদশা থেকে মসজিদটিকে নতুন রূপ দেন। পরবতী সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৩ সনে মসজিদটি দ্বিতীয় দফায় সংস্কার করা হয়ছে। মসজিদটির গায়ে সাঁটানো আরবী শিলালিপি (ভাঙ্গা) থেকে ধারনা করা যায় মসজিদটি সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমলে স্থানীয় ফৌদারী আশ্রাফ খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিলো (১৩৩৮-১৩৪৯) সে হিসেব মসজিদটির বয়স প্রায় পৌনে সাতশত বছর। মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় দুটি পাকা কবর রয়েছে। এ রূপ পাকা কবর, অলিপুর, শিলন্দিয়া সহ প্রায় সকল মসজিদের পাশেই বর্তমান। ধারণা করা হয় এগুলো নির্মাতা শাসকদেরই হবে। আরবী শিলালিপি সাটানো মসজিদগুলো আফগান বা আরব বংশদ্ভুত শাসকদের শাসন আমলের এর ফাশী শিলালিপি সাটানো মসজিদগুলো মোগল বাদশাদের আমলের। আশ্রাফপুর গ্রামটি আশ্রাফ খানের নাম অনুসারেই হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

চাঁদপুর জেলার পশ্চিম প্রান্তেও অনেক গুলো মসজিদ ছিলো, যা নদীর ভাঙ্গানে মেঘনা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পুরাতন শিলা লিপি ও পুরাকীর্তি থেকে এটা সুস্পষ্ট চাঁদপুর অঞ্চলে প্রায় হাজর বছর আগে থেকেই সমৃদ্ধ জনপদ ছিলো। মুসলিম শাসকদের আমলে এখানে অত্যান্ত ও সুদৃঢ় প্রশাসনিক কাঠামো

বহাল ছিলো। সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ার কারণে খননকৃত প্রতিটি দিঘী উচু পাড় দিয়ে ঘেরা ছিলো সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক জলোচ্ছাসের লবণাক্ততা থেকে রক্ষার জন্যে পাড় উঁচো করার হয়েছিলো। দিঘীর পাড়গুলোর প্রস্থতার কারণে অনেকে মনে করেন দিঘী গুলোর পাড়ে সৈন্যদের থাকার আবাস ছিলো। প্রায় প্রতিটি দিঘীর পাড় সমভূমি থেকে কমপক্ষে বিশ ত্রিশফুট উঁচু ও প্রস্থ। মতলব নায়ের গাঁও (দঃ) ইউনিয়নের কাচিয়ারা কাঞ্চন মালার দিঘীরও একই অবস্থা। এই দিঘীটি প্রায় ত্রিশএকর জমি নিয়ে খনন করা হযেছে।

বর্তমান চাঁদপুর জেলার উপজেলা সমূহ সে সময়ে পাঁচটি পরগণার অন্তর্গত চিলো (ক) টোরা পরগনা খ) মেহের পরগনা গ) ধরলই পরগনা ঘ) পুরচন্ডি পরগনা ও করদি পরগনা পুরচন্ডি পরগণায় সদরদপ্তর ছিলো নরসিংহপুর। সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ নির্মিত রাস্তাটি চট্টগ্রাম থেকে নরসিংহপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো যা সমুদ্রের জলোচ্ছাস থেকে রক্ষাকারী আল হিসেবে নির্মিত হয়েছিলো। নরসিংহ পুরের বেতবুনিয়া নামে একটি গ্রাম ছিলো সেখানে সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ ছিলো। মসজিদটি সত্তর বছর পূর্বে মেঘনার ভয়াবহ ভাঙ্গানে বিলীন হয়ে গেছে। চাঁদপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব বাচ্চু মিয়াজী সাহেব লেখকের সাথে আলাপকালে জানান তিনি তার ছোট বেলায় মসজিদটি দেখেছিলেন। মসজিদে তখন নামাজ হতো না, নদীর পাড়ে বেত বনের মাঝে সেটি ভগ্নদশায় বহু দিন পড়ে ছিলো।

পরবর্তী পর্যায়ে মেঘনা গর্ভে তলিয়ে গেছে। তিনি আরো জানান অনুরূপ মসজিদ মেঘনা পাড়ে আরো অনেক জায়গায় ছিলো। মেঘনা পদ্মার মিলিত স্রোতের তোড়ে তলিয়ে গেছে অনেক পুরোন প্রত্নতাত্তিক নির্দশন। অনেক ঐতিহাসিকে ধারণা বেতবুনিয়া গ্রামের মসজিদটি হজরত শাহ চাঁদ আওলিয়া নির্মাণ করে ছিলেন। এই সুফী এক উচু পর্যায়ের প্রশাসক ছিলেন। সিলেট অঞ্চলে যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার পর তিনি চাঁদপুরে অঞ্চলে এসেছিলেন। হজরত রাস্তি শাহ্, হজরত শাহ শরীফ বোগদাদী, হজরত শাহ মাহমুদ বোগদাদী, হজরত শাহ মর্দান খা (মাদা খাঁ) হজরত নিয়মিত শাহ হজরত শাহ চাঁদ এরা সবাই সুফী ও যোদ্ধা ছিলেন, সমসাময়িক সময়ে নদী মাতৃক চাঁদপুর অঞ্চলে এসেছিলেন।

২০০৫ সালের ১২ আগস্ট খুবভোরে ফজরের নামাযের পর লেখক তার সহযাত্রী দেলোয়ার হোসেনকে নিয়ে নারায়নপুর আসেন। নারায়নপুর বাজার সংলগ্ন (গরুর হাটের পার্শ্বে) একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ আছে। ধারনা করা হয় মসজিদটি ১৪৯৪ –১৫১৮ সালের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিলো। তখন বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। ইতিহাস তাঁকে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য করে। তিনি দেশে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করেছিলেন। তার রাজ্য উড়িষ্যা থেকে কামরূপ ও ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ৯০৭ হিজরী সনের সমকালীন এক শিলালিপির অন্তঃলিখন থেকে জানা যায় তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে অনেক মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম প্রচারের জন্যে আলেম ও দরবেশগণকে বহু অর্থাদান করেছিলেন হোসেন শাহের দরবারে মুসলিম আমিরদের সাথে সাথে হিন্দু আমিরদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিলো। হিন্দুদেরকে তিনি বড় বড় উচ্চ রাজ কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। তার রাজত্বকালে বাংলায় শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দু জাতিয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। বাংলার হিন্দু সমাজ শ্রী চৈতন্য দেবের আহ্বানে পুনর্জাগরিত হয়ে ওঠে। মহা ভারতে বর্ণিত রাজ্যের আদলে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সপ্নে বিভোর হযে ওঠে।

১৫২৬ সালে বাবর পানি পথের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত ও হত্যা করে দিল্লীতে মোগল সম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তার প্রায় দশ / বার বছর আগে সুলতান হোসেন শাহের আমলে নারায়নপুরে একটি দিঘীর দক্ষিণ পাড়ে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, উত্তর পাড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যে কালী বাড়ী প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেহের কালী বাড়িতে যেমন কালী মূর্তি নেই, তেমনি নারায়নপুর কালি বাড়ীতেও কালী মূর্তি

নেই। এখানে একটি উঁচু পাকা বেদির ওপর বিরাট আকার এক বটগাছের নিচে কালী পূজা হতো এখনও হয়। বর্তমানে বট গাছটি নেই। ২০০৪ সালের বন্যায় গাছটি উপড়ে পড়ে যায়। কালী বাড়ি মন্দির কমিটি প্রায় পাঁচশত বছরের পুরানো গাছটি কেটে লাকড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। বট গাছটির সাথে সমবয়সী আর একটি ঝিরগাছ এখনো কালী বাড়িতে রয়েগেছে। লেখক কালী বাড়ির বর্তমান সেবায়েত গনেশ চক্রবর্তীর সাথে আলাপ করেছেন গনেশ চক্রবর্তী জানালেন পাকুড় গাছটি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে, অচিরেই গাছটি কেটে তার স্থলে নতুন কটি পাকুড় গাছ রোপন করা হবে।

পূর্বতন বটগাছের স্থানটি উঁচু বেদী নির্মাণ করে আরেকটি বটগাছ লাগনো হয়েছে। কালীবাড়ি এলাকায় রামঠাকুরের মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণকারী সচিন্দ্র চন্দ্র দাস জানালেন তিনি তার পূর্বসুরীর নিকট থেকে জেনেছেন কালীবাড়িটি রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তৎকারীন মুসলিম ফৌজদার মির্জা হোসেন আলী। বর্তমানে লোকনাথ ঠাকুরের ও একটি ছোট মন্দির আছে এখানে এটি রক্ষণাবেক্ষণ করেন দেবেন্দ্র সাহা নামে স্থানীয় একভদ্রলোক। তিনি জানালেন তার পূর্ব পুরুষের নিকট থেকে তিনিও শুনেছেন ফৌজদার মির্জা হোসেন আলী, কালীভক্ত ছিলেন এবং কালী বাড়িটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সত্যিকার অর্থে সুলতান হোসেন শাহের অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার ফসল, একই স্থানে কালীবাড়ি ও মুসলিম সম্প্রদারের জন্যে মসজিদ নির্মাণ । ধনাগোদা ও ডাকাতিয়া নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ মাঠের জলাবদ্ধতা নিরসন করে ফসল উৎপাদন বাড়াবার জন্যে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলেই নারায়নপুর থেকে হাজিগঞ্জের টোরাগড় অর্থাৎ ধনাগোদা ও ডাকাতিয়া নদীর সংযোগ খাল হিসেবে বোয়ালঝুরী খাল খনন করা হয়েছিলো।

পরবর্তীসময়ে মোগল আর পর্তুগীজ হার্মাদদের যুদ্ধে আল মগীবের সময় নৌপথ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের কারণে বোয়ালঝুরি খালটি পুনঃখনন করা হয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরাই সর্বপ্রথম বাংলায় আসে। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামা কালিফট পৌঁছার কয়েক দশক পর বাংলায় পর্তুগিজদের আগমন ঘটে। বাংলাদেশের মাধ্যমেই তারা সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে গোয়ায় উপনিবেশ গড়ে তোলে। নৌযাত্রায় পারদর্শী পর্তুগিজরা প্রথমে সাতওগাঁও অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। পরে ভাগীরথী নদীর তীরে হুগলিতে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। তখন ছিল সুলতানি আমল, বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। পর্তুগিজরা বাংলায় প্রথমে সাতগাঁও, চট্টগ্রাম সন্দ্বীপ ও হুগলিতে এসে বসতি গড়ে তোলে।

১৫৮০ সালে কিছু পর্তুগিজ ব্যবসায়ী ঢাকা ও শ্রীপুরে বসতি স্থাপন করে। এখান থেকে তারা মসলিন তোলা ও রেশমি পণ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি শুরু করে। তখনও ঢাকায় বাংলার রাজধানী পত্তন হয়নি। পর্তুগিজরা সতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় একটি কারখানা স্থাপন করে এবং পর্তুগিজ পাদ্রিরা গির্জা নির্মাণ করে। তবে তারা তাদের স্থাপনাগুলো রক্ষা করার জন্য কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। ঢাকা ছাড়াও পর্তুগিজরা বরিশাল, নোয়াখালীসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যবসা ও ধর্মীয় কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

মোগল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে পর্তুগিজরা হুগলিতে বসবাসের অনুমতি লাভ করে। তখন থেকে তারা মৌসুমি বসতি স্থাপনাকরীর পরিচয় মুছে স্থায়ী বসতির পরিচয় লাভ করে। শুধু তাই নয়, সম্রাট আকবর থেকে পর্তুগিজরা নিজ ধর্ম পালন, গির্জা নির্মাণ এবং খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অধিকারও পায়। বলাবাহুল্য, এ অধিকার তারা বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলার লোকজনের ওপর অপপ্রয়োগ করে। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ এলাকায় এখনো পর্তুগিজদের বংশ ধররা বসবাস করছেন।

ঢাকার অদুরে দক্ষিণে কলাকোপা-বান্দুরা নামক যে বর্ধিষ্ণু খ্রিস্টান পল্লী এখন দেখা যায়, ধারণা করা হয় তা শায়েস্তা খানের আমলে গড়ে উঠেছে।

বাংলায় আসা পর্তুগিজদের অনেকে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো। ফলে বেশ কিছু বর্ণসঙ্কর পর্তুগিজদের উদ্ভব ঘটেছিল বাঙালি তাদের ফিরিঙ্গি নামে অভিহিত করত। মারাঠিদের নিষ্ঠুর আচরণের জন্য যেমন তাদের বর্গি বলা হতো, তেমনি এসব বর্ণসঙ্কর পর্তুগিজদের স্বভাবের জন্য তাদের হার্মাদ বলা হতো। এদেশীয়দের ওপর অত্যাচার নির্যাতন ও লুটতরাজে এসব ফিরিঙ্গা বগীদের ছাড়িয়ে যেত। ফিরিঙ্গা বাজার নামে একটি স্থান রয়েছে চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের বহু স্থানে এখনো পর্তুগিজ বংশভূত লোকদের বসতি দেখা যায়। ইংরেজরা দুইশত বছর এদেশ শাসন করে লেডি তাদের বংশভূত লোকদের দ্বারা সৃষ্টি কোন লোকালয় বাংলাদেশে দেখা যায় না।

ঢাকায় আসা ইউরোপদের মধ্যে পর্তুগিজরা সবার আগে এলেও নিজেদের কারণে তারা বাণিজ্যিক কিংবা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ঢাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও অস্থিরমতি পর্তুগিজরা তার সদ্ব্যবহার করেনি। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ করলেও অন্ত র্কলহে তা ব্যর্থ হয়েছে। ইংরেজ ও আর্মেনীয়দের মতো শিক্ষা বিস্তারে পর্তুগিজরা এদেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি। অভিজাত ও ধনী পর্তুগিজরা ব্যভিচার ও অনৈতিক কাজে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। ঢাকায় সর্ব প্রথম গির্জা পর্তুগিজরা প্রতিষ্ঠা করলেও তার চিহ্নমাত্র আজ নেই। ঢাকায় পর্তুগিজদের স্মৃতি বিজড়িত কিছু না থাকলেও তাদের সঙ্গে করে আনা গোলাআলু, পেঁপে, পেয়ারা ও আনারস আমাদের নিত্যদিনের খাদ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

বাংলায় আসা পর্তুগিজরা নানা দল উপদলে বিভক্ত ছিল। তাদের ওপর কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন ছিল না। পর্তুগিজরা যখন এদেশে আসে তখন পর্তুগাল ছিল স্পেনের অধীন। বাংলায় আসা পর্তুগিজদের মধ্যে কেউ ছিল সরকারের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি কেউ ছিল ব্যক্তিগতভাবে আসা ব্যবসায়ী।

মেঘনা, ডাকাতিয়া, ধনাগোদা নদীর মধ্যে সংযোগ খাল হিসেবে বোয়ালঝুরি খাল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনকরে। অনেকে ধারণা করেন সে সময়ে নারায়নপুর বাজারের সংলগ্ন উপর একটি পাকাপুল নির্মাণ করা হয়েছিলো মসজিদ এবং মন্দির পুনঃ নির্মান করা হয়েছিলো। কিছুদিন পূর্বে ১৯৯০ সালে প্রত্নসম্পদের কথা বিবেচনা না করে পূর্বতন পাকাপুলটি ভেঙ্গে বোয়ালঝুরি খালের ওপর একটি আধুনিক ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। এই ব্রীজটি পেন্নাই বাবুরহাট সড়কের একটি গুরুত্ব পূর্ণ ব্রীজ। এরূপ একটি পুল মোগল আমলে বিক্রমপুরের মীরকাদিম খালের রেকাবী রাজার টঙ্গিবাড়ী খালের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দির থেকে লেখক দিঘীর দক্ষিণ পাড়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে আসেন, আলপ হয় মসজিদের বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণকারী হাফেজ আফজালুর রহমানের সাথে, তিনি জানান পলাশি যুদ্ধের পরে নারায়নপুর একটি হিন্দু প্রধান এলাকা হয়ে ওঠে, যার কারণে মসজিদটি দীর্ঘদিন অনাবাদি ছিলো। ১৯৬০ সনে এলাকার বিশিষ্ট ভদ্রলোক আঃ হামিদ পাটওয়ারী ও চাঁন বক্স প্রধানিয়া মসজিদটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেন। পুনঃ সংস্কার কালে তারা দেখতে পান মসজিদের প্রধান দরজার ওপর ফাসী ভাষায় লেখা একটি শিলালিপি রয়েছে, শিলালিপির বঙ্গানুবাদ হচ্ছে নিম্নরূপ '' পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ এক মোহাম্মদ তাহার প্রেরীত রাসুল।'' (পরবর্তীতে দুইটি লাইন পড়া যায় না, ভেঙ্গে গেছে)।

মির্জা হোসেন আলী, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বারশ ছয় হিজরীতে মসজিদটি সংস্কার সজ্জিত করেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সে সময়ে অর্থাৎ বারশ ছয় হিজরী সনে দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন মোগল

সম্রাট প্রথম শাহ আলম বাহাদুর গাজী (১৭০৭-১৭১২) তার আমল পর্যন্তই মোগল সাম্রাজ্যের তেজ কিছুটা ছিলো। সম্রাট শাহ্ আলম বাহাদুর গাজী আমলে সম্পূর্ণ রাজকীয় অর্থেই ফৌজদার মির্জা হোসেন আলী মসজিদটি সংস্কার সজ্জিত করেছিলেন। কচুয়া উপজেলার উজানী গ্রামের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির সাথে এই মসজিদটির স্থাপত্য শৈলীতে অপূর্ব মিল রয়েছে। শিলা লিপিও একই প্রকার। সেখানেও মোগল বাদশাহ বাহদুর গাজীর শাসন আমলের কথা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। উজানী মসজিদটিও একজন ফৌজদার নির্মাণ করেছেন। বখতিয়ার শাহ নামক ফৌজদায়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, নির্মাণের সাল ১১১৭ হিজরী অর্থাৎ নারায়নপুর মসজিদের নব্বই বছর আগে।

নারায়নপুর মসজিদের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে লেখকের মনে হলো সাম্প্রদায়িকশক্তিরূপে মুসলিম রাজা-বাদশাহদের চিত্রিত করার যে প্রয়াস ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকগণ পেছনে তা কতটা ভ্রান্ত ছিলো। সম্রাট আকবরের পূর্বে হিন্দু মসুলিম সম্পর্ক নিয়ে কেউ এতটা ভাবেনি। আকবরই প্রথম ধর্মকে পুঁজি করে মসনদ দীর্ঘস্থায়ী করার প্রয়াস পেয়েছেন। মোগল শক্তির ভারত জয়ের বহু পূর্বেই আরব ও তুর্কী শাসকরা ভারত বর্ষ শাসন করেছেন। শত শত বছরের মুসলিম শাসন আমলে যদি রাজা বাদশাহার ইচ্ছে পোষণ করতেন, তাহলে সারা ভারত বর্ষ থেকে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতো। কিন্তু মুসলিম শাসকরা ছিলেন যুগের চেয়েও বেশি আধুনিক। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা মুসলিম শাসকদের চালিত করেছে। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ্ , শাহজাদা আযিমুশান, শাহজাহাদা সুজা, দারাশিকো, নবাব আলীবর্দি খান ও সর্বশেষ সিরাজ উদ্দৌল্লাহ্ অসাম্প্রদায়ক চেতনার উজ্জ্বল ধারক।

এতদ সত্ত্বেও সম্রাট আকবর ও শাহাজাদা দারা শিকো ছাড়া অন্য সবাই হিন্দু জাতীয়তাবাদের চেতনার ধারক লেখকদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। শিবাজী, শ্রী চৈতন্য, ভাস্কর পন্ডিত, রাজা গনেশ, রায় দুর্লভ , রাজা রাজ বল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ। জগৎশেঠ রানা প্রতাপ সিংহ প্রমুখ উল্লেখ করার মতো কয়েকজন বেশ কয়েকজন সমর নায়ক বর্তমান সমরে ভাষায় সন্ত্রাস বাদীনেতা ভারত বর্ষ থেকে মুসলিমদের বিদায় করতে চেয়েছেন। ইতিহাসে পর্যালোচনা করলে একটি সত্য বেরিয়ে আসে মুসলমানদের ক্ষতি অন্য ধর্মালম্বীদের চেয়ে মুসলিম নামদারী বাদশাহরাই বেশি করেছেন।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি নদী বেষ্ঠিত এলাকা মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ফরিদপুর বরিশাল- ও চাঁদপুর অঞ্চল। নদী প্রবাহের সাথে এই অঞ্চল গুলোর জীবন প্রবাহ তথা কৃষি, শিল্প নৌ-পরিবহন ব্যবসা বানিজ্য জীববৈচিত্র সহ সকল কিছুই জড়িত। বাংলাদেশের তিনটি বড় নদীর একটি মেঘনা। মেঘনার উৎপত্তি স্থল বর্তমান ভারতের লুসাই পাহাড়, ভারত সীমান্ত পর্যন্ত এর নাম বরাক নদী। বরাকনদী ভারতের মনিপুর রাজ্যের চোরা চাঁদপুর জেলার সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় এসে সুরমা কুশিয়ারা এবং ভৈরব এসে মেঘনা নাম ধারন করে। চাঁদপুর এসে পদ্মার স্রোতের সাথে মিলিত হয়ে লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী হাতিয়া হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এই পথ ধরেই একদিন আরব বনিকরা ও পরবতী সময়ে মুসলিম শাসকগণ সমতট ও কামরূপ তথা আসাম রাজ্যের প্রবেশ করেছে। মেঘনার স্রোত ধারার সাথে এ অঞ্চলের লক্ষ কোটি মানুষের বিগত হাজার বচরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে । মেঘনা যেমন জনপদ গড়তে সাহায্য করেছে তেমনই মেঘনার ভংকর ভাঙ্গানে বহুশহর, নগর, বন্দর লোকালয় ধ্বংশ হয়ে গেছে। বিলীন হয়েছে হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমি, বাড়ি ঘর বাগ-বাগিচা হাট বাজার মসজিদ মন্দির মাদ্রাসা সহ ছোট বড় নানা স্থাপনা। সমৃদ্ধ নদীপথের কারণে পর্তুগীজ জল দস্যুরা এখানে দুর্গ পর্যন্ত পর্যন্ত স্থাপন করেছিল। চাঁদপুর জেলার সাহেবগঞ্জ এলাকায় বসতি স্থাপন করার পর পর্তুগিজদের মধ্যে অনেকে ভাড়াটে সৈন্য এবং জলদস্যু হিসেবে বেশ নাম ডাক লাভ করে।

বাংলায় নিজেদের অবস্থান সংহত করার জন্য যখন কিছুসংখ্যক পর্তুগিজ স্থানীয় নিয়মরীতি মেনে চলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন অপরাপর পর্তুগিজরা বাংলা ও আরাকান উপকূলে দস্যুবৃত্তি ও দাস ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। পর্তুগিজরা সরাসরি মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরলেও মোগলদের শত্রুর পক্ষাবলম্বন করত। শহর-বন্দর ধ্বংস, লুটতরাজ ও নিরীহ-নিরপরাধ মানুষ হত্যা করত। তখন বাধ্য হয়ে সম্রাট শাহজাহান বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে পর্তুগিজদের তাড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন। ১৬৩২ সালে পর্তুগিজদের বহু বসতি যেমন হুগলি মোগলদের অধীনে চলে যায়। হুগলি থেকে বিতাড়িত হয়ে কিছু সংখ্যক পর্তুগিজ এ সময় পূর্ব বাংলায় চলে আসে।

পর্তুগিজ, আরাকানি মগ জলদ্যুদের হাত থেকে রাজধানী ঢাকাকে রক্ষার জন্য মোগল সুবেদাররা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা বুড়িগঙ্গা নদীর চরে স্থায়ীভাবে বসতি নির্মাণকালে খাঁ জমজম ও বিবি মরিয়ম নামে দুটি বিশালকায় কামান স্থাপন করে। এ দুটি কামানের গগনবিদারী তোপের আওয়াজ শুনতে পেলেই সে সময় ঢাকাবাসী বুঝতে পারত হয়তো কোন পর্তুগিজ কিংবা মগ জলদস্যু ঢাকায় হামলার জন্য পাঁয়তারা করছে। তবে নদীমাতৃক বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল ছিল দস্যুবৃত্তির জন্য অবারিত। বাংলাদেশের গ্রামঞ্চল থেকে পর্তুগিজরা মানুষ ধরে নিয়ে হুগলির বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করত। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনকে জোর করে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করত। অপহরণ, ধর্ষণ ও খুনসহ তাদের অত্যাচারের সীমা এমন পর্যায়ে পৌছে ছিল যে, বাধ্য হয়ে শায়েস্তা খান তাদের নির্মূল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সময় ঢাকা ছেড়ে বেশ কিছু পর্তুগিজ ব্যবসায়ীর দেশের অভ্যন্তর ভাগে বসবাস শুরু করে।

মেঘনার নদীর তীর ঘেষে তৈরী করা মসলিম শাসকদের অনেক কীর্তি নদীর গর্ভে তলিয়ে গেছে। নদীর ভাঙ্গনের কারণে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে কোটি মানুষ। চাঁদপুর জেলার দু'টি শাখা নদী ডাকাতিয়া ও ধনাগোদার মিলনস্থল মেঘনা। বর্তমান চাঁদপুর শহরের কাছে ডাকাতিয়া মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। ধনাগোদা মতলব উপজেলার ফরাজিকান্দি এখলাসপুরের কাছে এসে মেঘনায় পতিত হয়েছে। এ দুটি নদীর উৎসস্থল একই নদীতে কুমিল্লা জেলার গোমতী নদী।

ডাকাতিয়া মেঘনার মধ্যবর্তীস্থলে মুসলিম শাসন আমলে গড়ে ওঠেছিল নিরাপদ ও সমৃদ্ধ এক জনপদ। এই জনপদের কৃষি কাজ ও উন্নত যোগাযোগের জন্যে বোয়ালঝুরি নামক দেশের অন্যতম এক বৃহৎ খাল খনন করেছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ সময়টি ছিলো ১৪৯৪ থেকে ১৫১৮। অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় চতুদর্শ শতকের শেষ ভাগের প্রয়লংকারী ভূমি কম্পের া পরে খালটি খনন করা হয়। আসাম্প্রদায়িক সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পর, এই খালটি বহুবার পুনঃ খনন বা সংস্কার করা হয়েছে। নারায়নপুর মসজিদের উত্তর পার্শ্বে একটি বড় জলাশয় রয়েছে। জলাশয়ের উত্তর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বোয়াল ঝুরিখাল। মাঝখানে ৫০০ ফুট প্রস্থ একখানি জমি। এখানেই প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের পুরনো দুটো গাছ ছিলো, বট গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে অবশিষ্ট গাছটি এখনো রয়েছে। কালী মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত লেখককে জনোলেন এটি একটি পাকুলগাছ। ঠাকুর জানালেন সাড়ে পাঁচশত বছর আগের ইতিহাস।

রাজা কংশ নারায়ন খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ অঞ্চল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব চালাতেন। তিনি মুসলিম সুবেদার ইসলাম খানের স্থানীয় ফৌজদারের বন্ধু ছিলেন। তিনি মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের বিরুদ্ধে সুবেদার ইসলাম খানের সৈন্য দলের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেন।

১৬১১ সালে চাঁদপুর অঞ্চলে সংগঠিত পর্তুগিজ মোগলদের যুদ্ধে রাজা কংশ নারায়ন মোগল পক্ষে ছিলেন। নারায়ন বাজার সংলগ্ন এক গম্বুজ মসজিদটির খানিক দুরে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার সময় ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই কালী বাড়িতে কালী মুর্তি প্রতিষ্ঠা না করে একটি বট গাছ ও একটি পাকুড় গাছ লাগান কংশ নারায়ন । এ সময়ই নিরাপত্তার কারণে ডাকাতিয়া ও ধনাগোদা নদীর মধ্যে নৌ চলাচলের জন্য বোয়াল ঝুরি খালটি পুনঃ খনন করা হয়। মোগল সম্রাট প্রথম শাহ্ আলমের সময় এটি পুনরায় সংস্কার করা হয়েছিলো। সম্রাট শাহ আলম ভারত শাসন করেন ১৭০৭ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত।

মুসলিম শাসকরা ভীনদেশ থেকে রাজ্য জয়ের নেশায় এই অঞ্চলে আগমন করলেও প্রজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা রাজস্বের একটি বড় অংশ প্রজাকল্যাণে ব্যয় করেছেন। রাজকীয় অর্থে অনেক মন্দির উপাসনালয় তৈরী করে দিয়েছেন।

ভিন্ন ধর্মের প্রতি ঔদর্য্যে প্রদর্শন করেছেন মানুষের পানীয় জলের জন্যে খনন করেছেন বড় বড় জলাশয় দিঘী। হাজার হাজার মাইল রাস্তা ঘাট পুল নির্মাণ করেছেন। মতলব (দঃ) উপজেলার কাঁচিয়ারা গ্রামের কাঞ্চনমালার দিঘী তেমনই একটি। কাঞ্চন মালার দিঘির পেছনে হিন্দু মসুলিম প্রেমের একটি কাহিনী এই অঞ্চলে জনশ্রুতি হিসেবে প্রচলিত আছে। মোগল বাদশাহ আকবর ছাড়া পরধর্ম আত্মাসাৎ করার ঘটনা ভারত উপমহাদেশে আর দেখা যায় না। ইতিহাস প্রমান করে, অসাম্প্রদায়িকতার মোড়কে ভারত বর্ষে একক ধর্ম হিসেবে আকবর 'দীন -এই-ইলাহী' নামক উদ্ভট ধর্ম তৈরি করে মুলত ভারত বর্ষে সর্বপ্রথম রাজ্য শাসনের স্বার্থে ধর্মকে ব্যভহারের কুদৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। লোকজন বলে থাকে ব্রিটিশ শাসকরাই এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর জন্যে দায়ী সত্যিকার অর্থে ধর্মকে সাম্রাজ্য রক্ষার হাতিয়ার ব্যবহার শুরু করেন, মোগল সম্রাট আকবর।

ব্রিটিশ শাসনেরও আগে মোগল আমলের ভারতেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের ধারাটি তৈরি হয়। তখনও আধুনিক সেক্যুলার নেশন ও নেশন স্টেটের ধারণাটি রাজনৈতিক সংজ্ঞা (Political definition) লাভ না করায় দুই সম্প্রদায়কে দুই স্বতন্ত্র জাতি পরিচয়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। তবে আধুনিক নেশন স্টেট বা জাতিরাষ্ট সম্পর্কে সেই অনাধুনিক যুগে কোন ধারণা বা চেতনা না থাকা সত্বেও অমোগল যুগের সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে মোগল যুগের সম্রাট হুমায়ুন, আকবর ও যুবরাজ দরাশেকো (সম্রাট শাহজাহানের বড় ছেলে) পর্যন্ত 'সিয়াসত-ই-দরবার' বা রাজদরবারের নীতি ছিল সাম্রাজ্যকে সর্ব ধর্মের প্রজাদের সমন্বয়ের ভিত্তিতে শাসন ও পরিচালনা করা। মোগল সম্রাট আকবরের আগে কোন মুসিলম বাদশাহ ভারতী রমণী - বিশেষ করে হিন্দু রমণী (রাজপুত, জাঠ ইত্যাদি) বিয়ে করে ওই সম্প্রদায়ের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে বা সম্পর্ক স্থাপনে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তারা বরং পারস্য বা কাবুল কান্দাহার থেকে আনা কোন ক্রীতদাসী বা ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসা কোন মুসলমান পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে প্রধান বেগমের (রাণী) পদে বসাতেন। যুদ্ধে পরাজিত হিন্দু বা অসুমলিম রাজার পরিবারে সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে তারা হারেমে রক্ষিতা হিসেবে রাখতেন কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা দিতেন না। এরূপ ঘটনা মোগল পুর্ব মুসলিম শাসনকর্তাদের আমলে ছিলো। তবে ইসলাম ধর্ম এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে না। আকবর হিন্দু রমনীদের রক্ষিতা থেকে স্ত্রীয় মর্যাদা দেন।

আকবর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। তিনি হিন্দু রাজকন্যাকে বিয়ে করেন এবং তার আমীর ওমরাহ ও সৈন্যদের হিন্দু নারীদের বিয়ে করতে উৎসাহ প্রদান করেন। ভারতে মুসলিম শাসনামলে গোড়ার দিকে তাদের হাতে পরাজিত হিন্দু রাজাদের পরিবারের নারীরা যে দল বেঁধে 'জহরব্রত' (বিষপানে) দ্বারা আত্মহত্যা করতেন তার কারণ ছিল তীন ধর্মী মুসলিমদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। বিজয়ী

তুর্কি বা পাঠানদের হাতে নিজেদের আভিজাত্য, ধর্ম ও সম্ভ্রম খোয়ানোর চেয়ে তারা আত্মবিসর্জন দেয়া অনেক সম্মানের কাজ মনে করতেন। দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুন এই ধারাটি বদল করার প্রথম উদ্যোগ নেন। তিনি নিজের নামে উপাধির সঙ্গে 'হিন্দুস্থানের পাদশাহ (বাদশাহ) কথাটি যোগ করেন এবং কোন হিন্দুরাজ্য দখলে অনাগ্রহ দেখান এবং দখল করতে হলে পরাজিত রাজ পরিবারের নারীদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য সেনাবাহিনীকে আদশে দেন। তিনি এক হিন্দু রানীকে নিজের বোন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার রাজ্য আক্রান্ত হলে পাঠান সেনাপতি শেরশাহের সম্ভাব্য আক্রমনের মুখে দিল্লিকে অরক্ষিত রেখে আক্রান্ত হিন্দু বোনকে রক্ষায় সসৈন্য চলে যান। হিন্দু রানীর রাজ্য তাতে রক্ষা পায় কিন্তু শেরশাহ সেই সুযোগে দিল্লি দখল করে নেন।

দিল্লি পুর্নদখলের আগে হুমায়ুনকে সপরিবারে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। হুমায়ুনের পর তার পুত্র সম্রাট আকবরই প্রথম রাজ সিংহাসন নিরাপদ রাখার জন্যে সচেতনভাবে উপলব্ধি করেন, ভারতের দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও আত্মীয়তা সৃষ্টি করতে না পারলে এবং ভারতের উন্নত কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে সমন্বিত হতে না পারলে মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাড়াবে না এবং এদেশের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের কাছে তারা আপন হয়ে উঠতে পারবেন না। বরং 'বহিরাগত হামলাকারী' হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। ইসলামের সুমহান শান্তি সাম্যের বিষয়ে আকবরের তেমন জানা শোনা ছিলো না।

রাজ রাজত্ব ছাড়া পৃথিবীতে আরো অনেক কিছুই আছে, আকবর জানতেন না। তার জন্ম হয়েছিলো জঙ্গালে, পলায়ন পর রাজ্য হারা ভবঘুরে পিতা হুমায়ন নিজ সন্তান আকবরকে শুধু মুসলিম নামটি দিয়ে নামে মুসলমান পরিচয় দিয়েছিলেন। বীর তৈমুর হালাকু, চেঙ্গিস খানের রক্ত আকবরের শরীরে ছিলো। আকবর তেজোদীপ্ত সাহসী ছিলেন। রাজ্য হারা পিতার অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট তিনি দেখেছেন এবং এই উপলব্ধি থেকে সম্রাট আকবর তিনটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেন। এক তিনি রাজপুত ও জাঠ রাজপরিবারের নারী নিজে বিয়ে করেন এবং মোগল আমীর ওমরাদের এই মিশ্র বিয়েতে উৎসাহ জোগান। আকবরের প্রধান মহিষী ছিলেন যোধবাই বা উর্দিপুরি বেগম। তাকে তিনি ধর্ম পরিবর্তনে চাপ দেননি বরং তাকে নিজের প্রাসাদের ভেতরে পূজা করার ও গঙ্গাজল ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছিলেন। দুই আকবরের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ চিল হিন্দুদের (সব অমুসলমান সম্প্রদায়ের) ওপর থেকে 'জিজিয়া কর' প্রত্যাহার। মুসলমানদের এই করটি দিতে হতো না। এই 'জিজিয়া কর' ছিল মোগল সাম্রাজ্যের অমুসলমান সম্প্রদায়গুলোর ওপর এক বিরাট অর্থনৈতিক চাপ এবং এই কর দেয়া এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক নীতির জন্য নিজ দেশে নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করতেন। যুদ্ধ না করার শর্তে তাদের এই কর দিতে হতো। রাজ্যে যাতে ধর্মের জন্যে বিদ্রোহ না হয় সে কারণে মুসলিম শাসকরা 'জিজিয়া করের' ব্যবস্থা করেছিলেন। জিজিয়া করের অর্থ যুদ্ধের খরচ ও সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় করা হতো। মুসলিম ছাড়া অন্যদের রাজকীয় সেনা বলে যোগ দিতে হতো না।

শুধু জিজিয়া কর তুলে নেয়া নয়, আকবর তার সভাসদ ও সর্ব্বোচ্চ সরকারি পদেও রাজা বীরবল, রাজা টোডারমল, রাজ মানসিংহের মতো ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে শুরু করেন। তিনি শাসন পরিচালনাতেও ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ফার্সি হরফে হিন্দি বা হিন্দুস্থানীয় ভাষা লিখে তা সেনাবাহিনীর ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করেছিলেন। তার এই প্রচেষ্টা থেকেই উর্দু ভাষার জন্ম। উর্দির অর্থ যেমন সৈন্যদের পোশাক, উর্দুর অর্থ তেমনি সৈন্যদের ভাষা। তার আরেকটি বড় পদক্ষেপ ইসলামের একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে দ্বীন-ই-ইলাহী নামে নতুন ধর্ম প্রবর্তন। এই নতুন ধর্ম প্রবর্তন ভারতের হিন্দু মুসলিম কোন সম্প্রদায়ই মেনে নেয়নি ফলে সমগ্র ভারত জুড়ে ধর্মে ধর্মে যে সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠেছিলো তা নষ্ট হতে শুরু করে। হিন্দুরা মনে করতে থাকে মুসলিম

আকবর তাদের ধর্ম নষ্ট করা শুরু করেছেন, মুসলিমরা আকবরকে অমুসলিম ও ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করে। সিংহাসন রক্ষা করতে গিয়ে আকবর পিতার ধর্ম ইসলাম ও স্ত্রীর ধর্ম হিন্দু দু'ধর্ম থেকেই বাধার সম্মুখীন হন।

আকবরই তার ছেলে এবং ভাবী সম্রাট জাহাঙ্গীরকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি যদি হিন্দুস্থানের মানুষের মন জয় করে তাদের প্রকৃত শাসক হতে চাও, তাহলে তোমাকে আগে পুরোপুরি হিন্দুস্থানী (ভারতীয়) হতে হবে। মোগল সাম্রাজ্য যাতে তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি অনুযায়ী শরিয়া ল' বা ধর্মীয় বিধান দ্বারা চালিত না হয় সেজন্য আকবর সভাসদ আবুল ফজলকে সেকুলার আইন প্রণয়ন এবং সাম্রাজ্যের সব অংশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই আইন আইন-ই-আকবরি নামে পরিচিত। একজন বিট্রিশ ইতিহাসবিদের মতে, 'আকবরের রাষ্ট্র সাধনা যদি সফল হতো, তাহলে ইসলামী মতবাদ চিরতরে ধ্বংস হয়ে আধুনিক ইউরোপীয় গণতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতো। হিন্দুসহ ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা স্মরণ করে মোগলে আযম হিসেবে, মুসলিমদের কাছে তিনি ধর্মাদ্রোহী ।

ইউরোপের আগেই ভারতবর্ষে একটি প্রকৃত সেক্যুলার রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পথ সুগম হতো এবং সব ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতির মহামিলনে একটি ভারতীয় মহাজাতি এতদিনে গড়ে উঠতে পারত। যেখানে ধর্মের নামে মানুষকে শোষন করা বন্ধ হতো। আকবরের রাষ্ট্র সাধনার বিরুদ্ধে তখনই মুসলমান ধর্মীয় নেতারা প্রতিবাদ শুর করেছিল। সুদৃঢ় রাজ শক্তির সামনে তারা মাথা তুলে জেহাদ ঘোষণা করেছিলো। বাষ্ট্রিয় শক্তির সম্মুখে প্রথম অবস্থায় প্রতিরোধ গড়তে পারেনি সত্য। তবে সাচ্চা মুসলিম হিসেবে আকবরের ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে আত্মবির্জন দিয়েছে বীরের মতোই।

সকল কালে সকল সময় প্রকৃত মুসলিমের শেষ কথা হচ্ছে আল্লাহ ভক্তি। সূর্যমুখী ফুলের মতো তাঁর সকল কাজ কর্ম দৈন্দিন জীবন যাত্রা উর্ধ্বমুখী, চিন্তা, চেতনা, ধ্যান ধারণা জীবন যাত্রা সব কিছুই আল্লাহ্‌র রাহে উৎসগীকৃত। মুসলমানরা ঐহিক সর্ম্পককে কখনোই গুরুত্ব দেয়নি। তাই বলে একথাও বলেনি বৈরগ্য সাধনে মুক্তি। হিন্দু সহ ভারত বর্ষের আদিকালের ধর্মমতে পরকালকে থোড়াই পরওয়া করা হয়েছে। ওদের কাছে ইহকালেই সর্বস্ব। তারা জীবনকে ভোগ করার ষোলকলা পূর্ণ করেছে, নৃত্য, সঙ্গীত, উৎসব মদ আর নারী ওদের কাছে ইশ্বর প্রেমের হাতিয়ার। আকবরের নেতৃত্বে মোগল শাসকরা ইসলামকে বাদ দিয়ে জীবনকে উপভোগ করা শুরু করলো নৃত্য সঙ্গী নারী আর মদ দিয়ে জীবন ভোগের জন্য ওরা কাঁদলো, কাঁদালো, ভালো বাসলো। নারীর জন্য দরিদ্রের সম্পদ লুণ্ঠন করে বানালো তাজমহল। পরনারী অপহরণ করে হেরেমে ভরলো মোগল শাসকরা।

হিন্দু স্থান আর হিন্দু ধর্ম এক কথা নয়। হিন্দু ধর্মের নামে হিন্দু স্থানের নাম হয়নি বরঞ্চ হিন্দু স্থানের অধিবাসীদের ধর্মের নাম স্থানের নাম অনুসারে হয়েছে । একথা অনেকেই আজ জ্ঞাত নন। আকবর হিন্দুদের জন্যে অনেক কিছুই করেছে শুধু নামটুকু ছাড়া। রাজপুত ঘরানায় রাজকন্যা যোধবাইদের জন্য ধর্মসহ সকল কিছু বির্সজন দিয়েছেন তিনি। হিন্দু সেনাপতি এবং সৈন্যদের একটা বিরাট অংশ আকবরের অনুগামী ছিলো, ফলে আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে, মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও তাদের অনুসারীরা তেমন সফলতা লাভ করেননি। আকবর যখন বুড়ো হয়ে পড়েন তখন প্রাসাদ চক্রান্তেই রাজা বীরবল নিহত হন। আবুল ফজলও ছিলেন মুসলিম মুজাহিদদের রোষের পাত্র। তিনিও ধর্মদ্রোহীতার আঘাতের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হন। নিজের প্রিয় সভাসদদের হারিয়ে আকবর ম্রিয়মাণ চিত্তে শেষ জীবন কাটিয়েছেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর তার রাষ্ট্র সাধনার ধারা অব্যাহত থাকেনি।

পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কেউই দ্বীন-ই-ইলাহি নিয়ে মাথা ঘামাননি। তারা আকবরের ধর্ম সমন্বয়ের নীতি দ্বারা চালিত হওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। নিজ পিতামহ প্রপিতা মহের ধর্ম ইসলামকে নিজেদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু আকবরের আমলের সেক্যুলারপন্থী প্রধান সভাসদ ও উপদেষ্টাদের হত্যা করে মুসলিম মুজাহিদয়া যে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে তাকে বাধা দেয়ার ব্যাপারে জাহাঙ্গীর বা শাহজাহান কেউ তৎপর ছিলেন না। আকবরের উত্থান ভারতবর্ষে ইসলামকে দুর্বল করে দিয়েছিলো। ইসলাম তার পূর্নাঙ্গ রূপ নিয়ে কখনও ভারতবর্ষে বিকশিত হতে পারেনি। অসাম্প্রদায়িক ভারত প্রতিষ্ঠার সচেতনতা আবার দেখা দেয়।

শাহজাহানের বড় ছেলে এবং ক্রাউন প্রিন্স দারাশিকোর মধ্যে। শেষ বয়সে সম্রাট শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে দারাশি কোকে তিনি ভাবী সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন তার হাতেই সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এটা তার ছোট ছেলে ইসলামী আর্দশে অনুপ্রাণীত আওরঙ্গজেবের সহ্য হয়নি। তিনি তখন দাক্ষিণ্যাত্যের সুবেদার (গভর্নর) তিনি পিতার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে দিল্লির শক্তিশালী মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দারা এবং অপর দুই ভাই মুরাদ ও শাহ সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের পরাস্ত করেন। আওরঙ্গজেব ইসলামিক শিক্ষায় যেমন সুপন্ডিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন কঠোর হৃদয় এক নৃপতি অমিত বিক্রম আর কুশলী যোদ্ধা হিসেবে তার খ্যাতি ছিলো জগৎ জোড়া।

আওরঙ্গজেব ছিলেন সুন্নি মুসলমান দারা ছিলেন খৃষ্ট ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। লেখাপড়াতেও খুব চৌকস ছিলেন। আওরঙ্গজেব আরবী, ফারসি ভাষায় ছিলেন সুপন্ডিত। অপর দিকে দারা সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করে ছিলেন। রাজ্য শাসনের চেয়ে আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন। তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ উপনিষদকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। মুসলিম মুজাহিদরা দারাকে উপনিষদ অনুবাদ করার দায়ে ইসলাম ধর্মের অবমাননাকারী এবং ধর্মাদ্রোহী আখ্যা দেয়। ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশে শাহী মসজিদগুলোতে দাবিশিকোর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হয় এবং সেনাবাহিনীর মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত সোনানায়ক ও সৈন্যগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

শাহজাহান ফতোয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দারাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম সেনানায়ক ও আমলাদের প্রচন্ড বিরোধীতার কারণে দারাশিকো কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি। মুসলিম ধর্মীয় নেতাগণ ভারত বর্ষে ইসলামের ঘোর দুর্দিন দেখে আওরঙ্গজেবকে ক্ষমতা দখল করার জন্যে আহ্বান জানান। ধর্মীয় নেতাদের আহ্বানে সাড় দিয়ে আওরঙ্গজেব বিশাল মুসলিম বাহিনী নিয়ে দিল্লি দখল করে বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে দিল্লি দুর্গে বন্দী করে রাখেন এবং ধর্মদ্রোহীতার কারণে দারাকে মৃত্যু দন্ড প্রদান করেন। হত্যার আগে দিল্লির ১৬ জন ধর্মীয় নেতা বা আলেম এক ফতোয়া জারি করেন যে, দারাশিকো কাফের। তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও প্রচার করেছেন। হিন্দু রমণীদের সাহচার্য পাবার পছন্দনীয়, নিয়িমত নৃত্য-গীতের আসর বসান।

আর কিছুদিন পর তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে হিন্দু ধর্মে দীক্ষা নেবেন। সুতরাং এই ধর্মদ্রোহীকে ধর্মের বিধান মতেই হত্যা করা দরকার। আওরঙ্গজেব ঘোষণা করেন এর সঙ্গে সিহংাসন নিয়ে ভ্রাতৃ বিরোধের কোন সম্পর্ক নেই। দারাকে হত্যার পর তার মৃতদেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে দিল্লির রাজপথে সবাইকে দেখানো হয়। সিংহাসনের দাবিদার আর দুই ভাইয়ের মধ্যে মুরাদ মদ্যপানে অভ্যস্থ ছিলো। অন্য ভাই শাহ সুজা বাংলার গভর্নর ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের ভয়ে আরাকানে সপরিবারে পালিয়ে যান। আরাকানের মগ রাজার হাতেই তার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধের মায়া যাল মুরাদ। প্রকৃত মুসলিম আওরঙ্গজেব দিল্লীর শাসন ক্ষমতায় অতিষ্ঠিত হয়।

আওরঙ্গজেব সম্রাট হয়ে প্রথমে যে কাজটি করেন তা হল হিন্দুদের ওপর আবার জিজিয়া কর আরোপ এবং শরিয়তি আইন দ্বারা রাষ্ট পরিচালনার ব্যবস্থা করা। নিজে সুন্নি হওয়াতে শিয়া মুসলমানদের তিনি অমুসলিম হিসেবে দেখতে শুরু করেন। এবংতাদের প্রতি হিন্দুদের সমতুল্য নীতি প্রয়োগ করেন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুন্ডা রাজ্য দুটি ছিল মুসলিম শাসনাধীন। কিন্তু তারা শিয়া মুসলমান হওয়াতে আওরঙ্গজেব এই দুটি রাজ্যকেও আক্রমন চালিয়ে ধ্বংস করেন। ভারতে পাঠান ও মোগল সম্রাটদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধার্মিক। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মতো ধার্মিক ছিলেন না এবং ধর্মকে রাজনীতির সাথে একত্র করে শাসন ব্যবস্থায় ব্যবহার করেননি। ফলে ভরতে মুসলিম শাসনের সুদীর্ঘ সময়েও কোন ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়নি। রাজার ধর্ম ছিলো ইসলাম প্রজা সাধারণ ইসলামি শাসন ব্যবস্থার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।

বর্তমানে সারা ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার সূচনা বিট্রিশ ভারতে নয়, মোগল ভারতে আকবর শুরু করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মকে আঘত না করলে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এতদুর ছড়াতো না। পরবর্তী সময়ে বিট্রিশ শাসকরা তাদের ডিভাইড এ রুল নীতির স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের গোড়ায় আরও জলসিঞ্চন করেছে মাত্র। ভারতবর্ষে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মুজাদ্দেদ আলফেসানির জন্ম হয়েছিলো। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, তার হাতে গড়া মুজাহিদরা ইসলামের ঝান্ডাউড্ডীস রাখার জন্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দিক ভ্রান্ত মোগল শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মুজাদ্দে আল ফেসানীর পূর্ণ নাম।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) বলেছেন ঃ ''শরীয়তের আকীদা-বিশ্বাসের উপর অবিচল প্রত্যয় এবং ফিকহের বিধানসমূহ সহজভাবে মেনে চলার মতো মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাসাউফের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তাসাউফের আর কোন উদ্দশ্য নেই। মুজাদ্দে আলফে সানীর সৃষ্ট আন্দোলনের ঢেউ শতাব্দির সীমা অতিক্রম করে আজো আছড়ে পড়ছে জালেমের দুর্গদ্বারে।

বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের বিপর্যয়ের মুলে আর একটি শক্তি কাজ করেছে, সেটি হচ্ছে তুর্কী ও মোগল শাসকদের কার্যকলাপ। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামের মধ্যে তুর্কীদের আগমন অনেক পরবতীকালের ঘটনা। এ কারণে তারা রাজতন্ত্রে যেমন - পাকা পোক্ত ছিলেন, ইসলামে তেমনটি ছিলেন না। দেশে দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের কৃতিত্ব। সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে সঠিক নেতৃত্ব দান করার যোগ্যতা তাদের ছিল না। মোগল শাসকদের ক্ষেত্রে এ কথাটিতো আরো ভয়াবহরূপে সত্য। মোগল শাসনামলের শুরুতেই ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলে।

মোগল বাদশাহ আকবরের বিভ্রান্ত চিন্তা ও বাংলায় পৌছে যায়। মোগল বাদশাহদের মধ্যে আকবর ছিলেন সবাইতে অশিক্ষিত। আকবরের প্রথম জীবনটি অত্যন্ত দুর্যোগময়। শের শাহের সাথে যুদ্ধ পরাজয়ের পর সিংহাসনহারা হয়ে হুমায়ুন যখন পলায়নে তৎপর ছিলেন তখন পথে আকবরের জন্ম। এ ভাগ্য-বিপর্যয়কালে দেশ থেকে দেশান্তরে যাযাবর জীবনযাপন করার কারণে পুত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হুমায়ুনের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। অতঃপর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পরপরই হুমায়ুনের মৃত্যুতে অল্প বয়সে আকবরকে রাজ্যশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়।

একদিকে তীক্ষ্ম বুদ্ধি এবং অন্যদিক শূন্য জ্ঞানভান্ডার আর এই সাথে বিপুল ক্ষমতা একটি মানুষের চরম আত্মভবিতার জন্য যথেস্ট। তিনি দেখলেন, তিনি বিপুল সংখ্যাগুরু বিধর্মীর বাদশাহ। সংখ্যালঘু মুসলমানদের সামরিক মেরুদন্ডরূপী তুর্কী ও পাঠানরা তার বিরোধী। কাজেই এ অবস্থায় সংখ্যাগুরুদের

মনতুষ্টির মধ্যেই তার রাজনৈতিক সাফল্য নিহিত। এ ক্ষেত্রে পা□ত সভাসদগণ তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলেন। তারা বোঝালেন, সহস্র বছর পরে ইসলাম পুরাতন ও অকেজো হয়ে গেছে, কাজেই নতুন ধর্মমতের প্রয়োজন। আর এ ধর্মের পয়গম্বর হবার যোগ্যতা ও অধিকার দিল্লীশ্বর ছাড়া আর কার বেশি আছে? কাজেই হিন্দুস্তানের সমস্ত জাতিকে গঙ্গা-যমুনার ধারার মতো এককার করে দেবার জন্য তৈরী হল 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্ম। সব ধর্মের অনুষ্ঠানগুলো এর মধ্যে গৃহীত হলো, বাদ দেওয়া হলো শুধু ইসলামকে। কারণ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বন্ধুত্ব চান আকবর। নিজেও ইসলামের বহু বিধি-নিষেধ অমান্য করতে লাগলেন। তিনি কপালে চন্দন লাগাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতে লাগলেন। সকাল-সাঁঝে সূর্য বন্দনাও শুরু করে দিলেন।

হিন্দুরা দেশে মূর্তি পূজার অবাধ অধিকার লাভ করলো। আর অন্যদিকে মুসলমানরা বহু ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার হতে বঞ্চিত হলো। বাদশাহর হারেমে নিয়মিত অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজা চলতে লাগলো। বাদশাহ নিজে হিন্দু ললনার পানি গ্রহণ করলেন। দরবারে হিন্দুরা বাদশাহকে ভগবানের আসনে বসালো এবং 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো' ধ্বনি উঠালো। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো। ধর্মকে ক্ষমতার জন্যে অপরিহার্য মনে করলেন আকবর। সাম্প্রদায়িকতার শুরু আসলে আকবরই করলেন। হিন্দুস্তানে ইসলামের এই দুর্দিনে ইরান থেকে বিতাড়িত ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন 'মুলহিদ' বা মালাহিদা' সম্প্রদায় দলে দলে এসে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে। মালাহিদাদের ইসলাম বিরোধী শিক্ষা আকবরের গৃহীত মতবাদের সাথে মিলে যাওয়ায় তিনি তাদেরকে সাদরে দরবারে স্থান দেন। তাদের নেতারা ধর্মীয় ব্যাপারে বাদশাহর গোপন উপদেষ্টায় পরিণত হয়। আকবরের এ ধর্মদ্রোহিতার ঢেউ বাংলার অভ্যন্তরেও পৌছেছিল। আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' ব্যর্থ হলেও তাঁর ইসলাম বিরোধী চিন্তার অনিষ্টকর প্রভাব সারা দেশের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এ চিন্তার প্রভাবকে বহুলাংশে দুরীভূত করে।

আকবর ও তার পরবর্তীকালে মুসলামন সমাজ দুর্দশার কোন স্তরে উপনীত হয়েছিল নিম্নোক্ত তথ্যগুলো থেকে জানা যাবে। (এক) যেখানে মানসিংহ ও রাজা টোডরমলের ন্যায় আকবরের ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ হিন্দু সহচরগণ তার দীন-ই-ইলাহী ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হননি, সেখানে শায়খ আবদুন নবী ও মাওলানামখদুমুল মুলকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেতাগণসহ দরবারের প্রায় সকল মুসলিম সভাসদই তার রচিত 'রায়েত নামায়' স্বাক্ষর দেন। (দুই) নওরোজ উৎসবের সময়ে শাহী মহলে আমন্ত্রিত মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেম ও ধর্মীয় নেতাগণকে বাদশাহ সুরা পানের আমন্ত্রণ জানান এবং তারা কৃতজ্ঞচিত্তে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাদাউনী আলেম সমাজের এ মর্মন্তুদ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। (তিন) জাহাঙ্গীর রাতে তার বন্ধুদের নিয়ে মদের আসর জমিয়ে তুলতেন।

শাহী মহলে সর্বপ্রকার ইউরোপীয়ের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং জাহাঙ্গীর এ সব ইউরোপীয়ের সাথে ভোর রাত পর্যন্ত সুরা পানে মত্ত থাকতেন। (চার) আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে সালাম প্রথা রহিত করা হয় এবং মুসলমানদেরকে নতজানু হয়ে বাদশাহকে সিজদা করতে বাধ্য করা হতো। (পাচ) এ সময় আইন করে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয় এবং মুসলমানদেরকে বহু অনৈসলামী আইন ও ফরমান মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। (ছয়) মসজিদগুলো মেরামত করা প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হতো না। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও মেরামতের অভাবে বহু মসজিদ ভেঙ্গে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অনেক মসজিদ হিন্দুরা ধ্বংস করে দেয় অথবা মন্দির নাট্যশালায় রূপান্তরিত হয়। জাহাঙ্গীরের সমকালীন বিজাপুরের মসজিদগুলো সম্পর্কে সমকালীন ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেছেন ঃ ''হিন্দুরা মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে মূর্তিপূজা করতো এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে দেবদেবীর বন্দনা গীত গাইতো।" বিজাপুর ও গোলকুন্ডার মসজিদ গুলো বাদশা আলমগীর তাঁর শাসন আমলে পুনঃ নির্মাণ করে দেন।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় এভাবে ইসলামকে ধ্বংস করার দেশব্যাপী চক্রান্ত চলে। যথাসময়ে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর (১৫৬৩-১৬৩৪ খৃঃ) বলিষ্ঠ কণ্ঠ বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে সতর্ক করে দিতে সক্ষম হয়। আলফেসানীর নিম্নোক্ত দাবিগুলো বাদশাহ মেনে নিতে বাধ্য হন।

১. বাদশাহকে সিজদা করার রীতি সম্পূর্ণরূপে রহিত করতে হবে।
২. মুসলমানদেরকে গরু জবেহ করার অনুমতি দিতে হবে।
৩. বাদশাহ ও তাঁর দরবারীদেরকে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে হবে।
৪. কাযীর পদ ও শরীয়ত বিভাগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
৫. সমস্ত বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী অনাচারকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।
৬. ইসলাম বিরোধী আইনগুলো রহিত করতে হবে।
৭. ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজদিগুলো আবাদ করতে হবে।

উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মুজাদ্দে আলফেসানীর সুদক্ষ কর্মীদল প্রেরীত হয়। তারা সর্বত্র জনগণের আকীদা ও চরিত্রের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালান। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলায় তখন চলছিল অন্ধকার ও জাহেলিয়াতের দুর্দান্ত দাপাদাপি। রাজশক্তির সহায়তায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পথ বেয়ে অন্ধকার ও অনাচার সন্তর্পণে এগিয়ে চলার অভিযান চলছিল। তখন ইসলামের ও বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলোকোজ্জ্বল যুগের অবসানে নেমে এসেছিল অন্ধকার যুগ। আর অন্য দিকে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতির দেড় দু'শ বছরের এসেছিল অন্ধকার যুগ। আর মুসলিম সুলতানদের সহায়তায় বাংলা সাহিত্যের উন্মোষের মাধ্যমে তারা হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও হিন্দু জাতির পুনরুত্থানের স্বপ্ন সফল করার পথে অনেক দুর অগ্রসর হয়েছিলেন। দ্বাদশ শতক থেকে পরবর্তী একশতকে মুসলিম আওলিয়া দরবেশগণ সারা ভারত বর্সে ইসলামকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন তা মুসলিম শাসকগণই দুর্বল করে দিয়ে ছিলেন।

বাংলার মুসলমান সমাজের বিপর্যয়ে যে সব উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তি যুগিয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের পর এবার মুল আলোচনায় আসছি বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম দু'শ বছর ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বিঘ্ন ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, পরবর্তী বিপর্যয়ের বীজ এ সময়ই রোপিত হয় এবং ইসলামী সমাজ মানসে অনাচার অনুপ্রবেশ এ সময় থেকে শুরু হয়।

এক দিকে ছিল প্রথম মুসলিম সমাজ গঠনকারীদের নিজস্ব দুর্বলতা এবং অন্যদিকে ছিল মুসলিম সমাজের নবাগত স্থানীয় সদস্যদের বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবধারা ও কর্ম চরিত্র গঠনে সতর্কতার অভাব। প্রথম দিকে আগত তুর্কী, আফগান, পাঠান, ইরানী মুসলামনগণ ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত ছিল না। তাদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ সমাজের অন্তর্গত। মুলত ভাগ্যান্বেষণেই উপমহাদেশের এ অঞ্চলে তাদের আগমন। তাই তাদের কাছে থেকে উচ্চ ইসলামী জ্ঞান ও উন্নত ইসলামী চরিত্র আশা করাও বৃথা। এর সাথে আগমন হয় একদল সুফীর। সুফীদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম। তাদের সাথে দু'চারজন উচ্চ শ্রেণীর আলেমের ও আগমন হয়। (১২২৪-১৩৯৫) এই সময় কালে বাগদাদে ইসলামী শিক্ষা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ছিলো হালাকু খানের বাগদাদ নগরী ধ্বংশের পর ইসলামী চিন্তা বিদরা মধ্য প্রাচ্য সহ মধ্য এশিয়া এবং ভারত বর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তখন অনেক সুফী সাধক বাংলাদেশে চলে আসেন।

তারা ধর্মের ব্যাপারে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল তা অবশ্যই করেছেন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞানের কথা বাদ দিলে ইসলাম আল্লাহর ওহীকে একমাত্র সত্য ও নির্ভূল জ্ঞান মনে করে। এছাড়া অন্য

সমস্ত জ্ঞানই সংশয় মিশ্রিত। কাজেই অন্য যে কোন জ্ঞান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার বিচার বিশ্লেষণ কোরানের আলোকে করা প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সুফীরা অনেক সময় ব্যাতয় ঘটিয়েছেন।

অন্য দিকে নতুন মুসলমান যারা হচ্ছিল তার সবাই স্থানীয়। তাদের কিছু অংশ ছিল পৌত্তলিক হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং অধিকাংশই ছিল হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মগোপনকারী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ভূক্ত। মোটামুটি এ সমগ্র শ্রেণীটিই পৌত্তলিক ও মূর্তির পূজারী । এ ছাড়াও তৎকালীন বাংলায় বহুল প্রচলিত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নাথ ও তান্ত্রিক ধর্মের অনাচার এবং যোগ ধর্মের অনিষ্টকর প্রভাব থেকে তাদের অতি অল্প সংখ্যকই মুক্ত থাকতে পেরেছিল। এ অবস্থায় দেশের শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কেন্দ্র থেকে গাফলতি ও ইসলামী জ্ঞানের প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি নতুন মুসলমানদের মানসিক গঠনে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুসলিম সমাজ গঠনের পূর্বাহ্নের এ ত্রুটি সামান্য ছিল না। ইতিপূবে আমরা বলেছি যে, মূর্তি ও প্রতিমা ভাঙ্গার কারণে বড় রকমের শিরক অর্থাৎ সরাসরি মূর্তিপূজা হারাম হবার ব্যাপারে নতুন মুসলমানদের মনে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু মূর্তিপূজা ছাড়া অন্যান্য ছোট খাট শিরকের সাথে আপোস করার মনোবৃত্তি এখান থেকেই গড়ে উঠেছিল। মক্কা মদিনার ইসলাম বহু পথ পাড়ি দিয়ে ভারতবর্সে আসার সময়, স্থানীয় জনগণের পিতৃপুরুষের অনেক কিছু নিজ দেহে ধারন করে ছিলো।

বাংলা অঞ্চলের অবস্থা ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা ছিলো এখানে মুসলমান সমাজ এ দেশের একটি স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজে রূপলাভ করে। এ সময়ের মধ্যে এ দেশে আরো দু'টি বড় পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে, মুসলিম শাসকগণ দিল্লীর অধীনতা পাশ ছিন্ন করে পরিপূর্ণ স্বাধীন মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বাংলার মুসলমানরা দিল্লির কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দিল্লি কেন্দ্রে থেকেও এ বিচ্ছিন্নতা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাংলার মুসলামনদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ উপমহাদেশের বাইরে মক্কা-মদীনা, বাগদাদ প্রভৃতি ইসলামী কেন্দ্র ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষার করার চেষ্টা করেন কিন্তু এ সাময়িক ও বিক্ষিপ্ত যোগাযোগ দিল্লি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে উদ্ভুত মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষতিপূরণ করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, এ সময় হিন্দুদের মধ্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় জাগরণ দেখা দেয়। এ জাগরণের পেছনে কেন্দ্র থেকে বিচ্চিন্নতার অবদান কম নয়। দিল্লি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে সুলতানদের বাংলার উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হয়। দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বাংলা থেকে ও লোক নিযুক্তি শুরু হয় এবং বাংলার অধিবাসীদের সুখ-দু:খের সাথেও সুলতানগণ একাত্ম হয়ে যান। এ ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাই ছিলেন সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কারণ পাল ও সেন আমল থেকে মূলত তারাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বের অংশীদার ছিলেন। এবারেও তাদের ডাক পড়লো। এর ফলে এতদিন পরে তাদের মধ্যে কিছুটা আত্মপ্রত্যয় ফিরে এলো। তারা আবার তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখতে লাগলো। মুসলমান শাসন ও মুসলমান সমাজ উভয়কেই গ্রাস করার স্বপ্নে তার বিভোর হলো। এ জন্য একদিকে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটানো এবং অন্য দিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ইতিপূর্বেকার বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম ও জাতির ন্যায় মুসলামানদেরক হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতির মধ্যে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা চললো। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহকে হত্যা করে রাজা গণেশ ও শিবসিংহ বাংলায় পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তারা সামাজিক ভাবে সফলও হন ।

মুসলমানদের অনেকেই হিন্দুদের এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা সুলতানদেরকে যথাসময়ে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। হযরত মুজফ্ফর শামস্ বলখী ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন

আজম শাহকে লিখেছিলেন যে, মুসলিম রাজ্যে বিধর্মীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নয়। গিয়াসুদ্দীনের সতীর্থ হযরত শায়খ নুর কুতবুল আলম ও এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত সুলতান তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পারেননি। যার ফলে তিনি হিন্দু অভ্যুত্থানের নেতা দরবারের প্রভাবশালী আমীর ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশের চক্রান্তে নিহত হন।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপায়ের মতে, গিয়াসুদ্দীন বল্‌খীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, যার ফলে গণেশ প্রমুখ হিন্দু আমীরগণ তাঁর শত্রু হয়ে পড়েন। কিন্তু গণেশ ও হিন্দু আমীরগণকে পদচ্যুত করার পরও দরবারে তাঁদের ক্ষমতা কেমন করে এত বৃদ্ধি পেলো, যার ফলে পরবর্তী তিনজন সুলতান প্রকৃতপক্ষে গণেশের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন, এ কথা আমরা বুঝতে অক্ষম। যাই হোক, গণেশ এক রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে গৌড়ের মসনদ অধিকার করেন। চার বছরের হিন্দু রাজত্ব মুসলিম নিধন-যজ্ঞের মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয়। গণেশ বাংলাদেশে আবার হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। গৌড়ে ও সারা বাংলাদেশে আবার মৃত সংস্কৃত ভাষার চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ রচনা চলছিল। অথচ ইতিপূর্বে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আমলে দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা ভাষায় 'ইউসুফ ও জুলেখা' কাব্য রচনা করেছিলেন।

রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় হিন্দুগণ এবার সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালালো। অন্তত নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রতিরক্ষার স্বার্থে এটাকে তারা অপরিহার্য মনে করলো। মুসলমান সুলতান, উমরাহ ও মুসলিম জনগণের অজ্ঞতার কারণে এ পথে তারা সাফল্যের সাথে অগ্রসর হলো। বিদ্যোৎসাহী মুসলিম সুলতানগণ কুরআন, হাদীস প্রভৃতি ইসলামী গ্রন্থাদির চর্চা ও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থাদির বাংলায় অনুবাদ করার এবং এ কাজে হিন্দু কবিদেরকে উৎসাহ দেবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। হিন্দু কবিদেরকে দরবারে ফুল-চন্দন দিয়ে বরণ করা হলো। মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা অপাংতেয় রয়ে যান। মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের অসম্পৃক্ততার জন্যে সাহিত্য থেকে ইসলাম অনুষঙ্গ বাধ পড়ে।

বাংলায় রামায়ণ রচনার খবর শুনে মনে হয় হিন্দুদের মধ্যে এক ধর্মীয় জাগরণের সঞ্চার হয়েছিল। লোকেরা দলে দলে কৃত্তিবাসকে অভিনন্দন জানাতে দৌড়াচ্ছিল। তেজস্বী পন্ডিত কৃত্তিবাসও এমন নিষ্ঠা সহকারে রামায়ণ রচনা করলেন যে, তাতে সুলতানের দরবারের সমস্ত হিন্দু অমাত্যের নাম দিলেন কিন্তু রামায়ণে 'যবন চিহ্ন' রাখবেন না বলে মুসলামান অমাত্য এবং সুলতানের নাম উচ্চারণ করলেন না। এরপর সুলতানদের দরবারে রামায়ন-মহাভারত পাঠের আসর বসতে লাগলো। কিন্তু তারা নিজ ধর্মের কোন উৎসবকে সার্বজনীন করার চেষ্টা করেননি।

শুধু সুলতানদের দরবারই নয়, সুলতানদের অন্তঃপুরে বেগমরাও দরবার করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র শুনতে লাগলেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শুনতে গিয়ে এক হেরেম মহিষী পদকর্তা চন্ডীদাসের প্রতি আসক্ত হয়েও পড়েন। এ ঘটনা উল্লেখ করে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেছেন ঃ "চন্ডীদাস রাজা গৌড়েশ্বরের দরবারে রাণীর সহিত গান করিতে গিয়াছিলেন। গান শুনিয়া ,বাদশাহের বেগম তাহার প্রতি অনুরাগিণী হন এবং রাজাকে মনের কথা বলিয়া ফেলেন। ইহাতে রাজা রাণী ও চন্ডীদাসকে বধদন্ড দান করেন। দন্ডটি ছিল অদ্ভুত রকমের। তাঁহাকে হাতীর পিঠে অধোমুখে বাঁধিয়া শিকারী বাজপাখি ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এ সময় সুলতান ,বেগম ও তাঁদের সভাসদগণ হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু ধর্ম -তত্ত্বের মধ্যে ডুবে গিয়ে রসাস্বাদন করছিলেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা কি হতে পারে! তাঁদের সামনে কুরআন-হাদীসের বাণী

বাংলা ভাষার মাধ্যমে তুলে ধারার চেষ্টা করা হচ্ছিল না। দরবারের ভাষা ছিল ফার্সী। সুলতানগল দেশে আরবী বা ফার্সী ভাষার চর্চা করেছিলেন এবং এ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। দু'একখানা অভিদান গ্রন্থ প্রণয়ণ ছাড়া এর তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুসলমানদের উচ্চ শ্রেণী ফার্সী ভাষা ব্যবহার করতো। মাদ্রাসাগুলোতে আরবী ও ফার্সী ভাষা পড়ানো হতো। কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা বেশি দুর অগ্রসর হতে পারতো না। তাদের বাংলা ভাষার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হতো। কাজেই হিন্দু শাস্ত্র পাঠ ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না।

সুলতানদের এই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা যে মুলত হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন এ ব্যাপারে লিখেছেন যে, হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের যে প্রচেষ্টা চলে তা-ই বাংলা ভাষার উন্নতির প্রথম ও প্রধান কারণ। এ সময় মুসলিম সুরতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়োপাখ্যানমুলক 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'কাব্য রচনাও চলে। এভাবে হিন্দু লেখকদের সহায়তায় বাংলা ভাষায় হিন্দু শাস্ত্র চর্চা এমনভাবে শুরু হয়ে যায় যে, সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গান হিন্দু দেব -দেবীগণের মাহাত্ম্য,জয়গান ও স্তব-স্তুতিতে ভরে ওঠে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দু ভাবধারা ও হিন্দুয়ানী শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমনকি এ সময় বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গান দেব-দেবীর মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ দেখে কয়েকজন মুসলমান কবির মনে ইসলামের বিজয় গাথা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির ও ইচ্ছা জাগে। তাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও হিন্দু কবিদের তৈরি করা শব্দ নিয়েই তাদেরকে এগিয়ে যেতে হয়।সুলতান শাসসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলের (১৪৭৪-১৪৮১খৃ.) শক্তিশালী কবি জৈনুদ্দীন তাঁর 'রাসুল বিজয়' কাব্যে সুলতানের গুণগান করে বলে চলেছেন ঃ

"দানে ধর্মে হরিশ্চন্দ্র মানে গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুক্ত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলু পঞ্চালী সন্ধান"

এ সময় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গাল কাব্যের উদ্ভর হয়। হিন্দুদের পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর লীলা, পূজা প্রচার ও ভক্ত কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ কাব্যগুলো মুলত প্রচারধর্মী। বিভিন্ন দেব-দেবীর গুণগান এ কাব্যগুলোর উপজীব্য। তবে এর মধ্যে স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্য বেশি এবং তাদের মধ্যে আবার মনসা ও চন্ডীই হচ্ছে প্রধান। মনসা সাপ ও বিষের দেবী। একদিকে রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয় উপাখ্যান, যে প্রণয় দেহবাদী, যেখানে আদিরসের আমদানি প্রচুর আর অন্যদিকে মনসা পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা, এ দু'য়ে মিলে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি বাংলা সাহিত্যে এমন একটি রূপ লাভ করলো যেখানে মুসলমানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অবধারিত ছিল। বাংলার প্রাচীন অনার্য সভ্যতায় সম্ভবত মনসার একটি বিশিষ্ট আসন ছিল। মনসার পুনরাবির্ভাবে তাই বাংলার গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেলো। মনসা মঙ্গালের পাঁচালী ও বেহুলার ভাসান গানের বন্যায় সারা বাংলাদেশ প্লাবিত হয়ে গেল। এ প্লাবনে সাধারণ মুসলমান সমাজের মৌলিক ধর্ম বিশ্বাসগুলোও ভেসে গিয়েছিলো । এ বিংশ শতকের প্রথম দিকেও দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মনসার ভাসান গানের প্রচলন ছিল। আজো কোন কোন মুসলিম সম্প্রদায় নদীতে ভেলা ভাসান কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ অনইসলামিক। হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে জমিদার শ্রেণী বিষয়টিকে উৎসাহ প্রদান করতেন।

এভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিরক্ষার মাধ্যমে হিন্দুরা তাদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের পথে অগ্রসর হলো। এ সময় ষোড়শ শতকের মুখে আবির্ভাব শ্রী চৈতন্য দেবের। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু ধর্ম ও বাংলার হিন্দু জাতি নতুন জীবনরসে সমৃদ্ধ হলো। প্রশ্ন হচ্ছে, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতির সমৃদ্ধিতে ইসলাম ও মুসলামনের ক্ষতি হবার

কারণ কি ? তাহলে কি হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতি তাদের সমৃদ্ধির কোন চেষ্টা করবে না ? এর জবাব একটিই। হিন্দুর সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি যদি তার নিজস্ব পথে আসে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এর সাথে মুসলমানদের পথ জড়িত হলে মুসলমান অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতদিনে সুলতানদের ও মুসলমান আমীরদের কৃপায় সাধারণ মুসলামানদের সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল হিন্দু ধর্মের দেবদেবী প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে। হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোও যদি বাংলায় ভাষান্তরিত হতো, তাহলে সক্ষম হতো।

আরবীতে বিরাট সাহিত্য সম্ভার মওজুদ ছিল। আরবী তখন দুনিয়ার সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী ভাষা হিসেবে বর্তমান ছিলো। কুরআনের তাফসীর, হাদীস, উসূল, মানতেক ,দর্শন, ভূগোল,অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আরবীতে হাজার হাজার গ্রন্থ প্রণীত হয়েছিল। কাব্যের ভান্ডারও সেখানেও কম ছিল না। আরবীর পাশাপাশি ফাসী ভাষা ও সাহিত্য এগিয়ে চলছিল। কিন্তু এগুলো থেকে বাংলার মুসলমান সমাজকে বঞ্চিত রেখে যথার্থ ইসলামী চেতনা-শূন্য হারেমের আয়েশী জীবনের বিলাস মদিরায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত সুলতানগণ আদিরসে পরিপূর্ণ হিন্দুর পৌরাণিক গালগল্পের আসর জমিয়ে বাংলাদেশে যে সংস্কৃতির উন্মেষ সাধন করলেন তা মুসলমানদের জন্য ছিল হলাহল সদৃশ্য। সুলতানগণ যথার্থ উদারই বটে ! সম্ভবত তাঁরা সারাদেশে একটি সাংস্কৃতিক স্রোতধারা প্রবাহিত করতে চাচ্ছিলেন। এর পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থ ও ছিল। তবে তাঁরা চাইলে শুধু ইসলামী গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে সারা দেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্লাবন আনতে পারতেন। কিন্তু তখন তাঁরা হতেন 'সাম্প্রদায়িক' । সম্ভবত এ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমুক্ত হবার জন্য সুলতান হোসেন শাহ প্রথমদিকে চৈতন্য দেবের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকবেন এবং এ জন্যই কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের মুখবন্ধে তাঁকে কৃষ্ণ অবতার রূপে গণ্য করেছেন ঃ

''নৃপতি হুসেন শাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি
অস্ত্রেশস্ত্রে সুপন্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার''

বৈষ্ণব আন্দোলন ও মুসলমানদের ওপর তার প্রভাব

শ্রী চৈতন্য ১৫০৬ খৃস্টাব্দ থেকে নদীয়ায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত' প্রচার করতে থাকেন। বৈষ্ণব ধর্শতত্ত্ব ও অন্যান্য ব্যাপরে শ্রী চৈতন্য ছিলেন বাংলার প্রাচীন কালের বৈষ্ণবদের অনুসারী। যুগ-ধর্মের তাগিদে তিনি সংকীর্তন ও নগর কীর্তনের প্রচলন করেন। বৈষ্ণবেরা সংকীর্তনে ভাবাবেগে আপ্লুত হলে ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিয়ে এবং পতাকা উড়িয়ে নগর-কীর্তনে বের হতো এবঙ আনন্দে উদ্বেল হয়ে নৃত্য-গীত করতে করতে শোভাযাত্রা সহকারে এমনভাবে রাজপথসমূহ প্রদক্ষিণ করতো যে, সারা শহর মুখরিত হয়ে উঠতো। এভাবে তারা সারা শহরবাসীকে কীর্তনের প্রভাবাধীনে আনার চেষ্টা করতো। এয়োদশ শতকে পারস্যের বিখ্যাত সুঝী মসনবীর কবি মওলানা জালালুদ্দীন রুমী এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। মসনবী তৎকালে বাংলার মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে শিক্সিত সমাজে সাগ্রহে পঠিত হতো। কাজেই শিক্ষিত সমাজে তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি অনালোচিত থাকার কথা নয়। সূফীদের 'হাল','যিকির'ও 'সামা'-র ন্যায় বৈষ্ণবদের মধ্যে 'দশা','কৃষ্ণনাম' ও 'কীর্তন' -এর প্রচলন ছিল।

সূফীদের 'ইশকের' ন্যায় বৈষ্ণবদের প্রেম এবং সূফীদের 'সাকী ও বুত ' বা 'শামা ও পরওয়ানার' ন্যায় বৈষ্ণবদের 'রাধাকৃষ্ণ 'একই কথা। আর সূফীদের 'অহদাতুল অজুদ' ও বৈষ্ণবদের 'অদ্বৈতবাদ' যে একই বস্তু তা সবার জানা। বৈষ্ণবদের এ পদ্ধতি ও ভাবধারা সূফীদের থেকে ধার করা না উপনিষদ ও ভাগবত থেকে গৃহীত-এ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিষম বিতর্ক। আমরা এ বিতর্ককে অর্থহীন মনে করি। আমাদের মতে উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আমরা ইতপূর্বে সূফীদের ওপর বেদান্ত,জরথুষ্ট্র ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছি। কাজেই সূফীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল বৈষ্ণবদের এ পদ্ধতি ও ভাবধারার উৎস উপনিষদ ও ভাগবত হওয়া মোটেই বিচিত্রকর কিছু নয়। এ ব্যাপারে আমরা ব্রিটিশ শাসন আমলের ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ই.সি.বেইলী,সি.এস.আই.লিখেছেন,"এতে কি কিছু আশ্চর্য হওয়ার কথা আছে যে, মুসলমানরা সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বহু দুরে সরে দাঁড়াবে, যার মধ্যে তাদের সংস্কার সম্বন্ধে কোনও সহানুভূতিও নেই-সত্যি কথা বলতে গেলে, তাদের অতি দরকারী বিষয়গুলো সম্বন্ধে কোনো কথাই নেই;অন্যদিকে সে প্রণালীর দ্বারা অনিবার্যভাবে এবং সহজেই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেতা করা হয়েছে, আর তা-ও তাদের সামাজিক প্রথার পরিপন্থীভাবে।

নিজের প্রণালীতে শিক্ষিত মুসলমান দেখছে যে, সে শাসন বিভাগের সব ক্ষমতা ও সকল রকম মাহিনা-মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ এগুলির সবই পূর্বে তারই একচেটিয়া অধিকারে ছিল। সে দেখছে যে, জীবন ধারণের একমাত্র সুযোগ-সুবিধা হিন্দুর হাতেই ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আজ উচ্চ শিক্ষিত

মুসলমানদের মন অসন্তোষে ভরে গেছে। তাদের এ মনোবৃত্তির কারণ, তাদের ধর্মের উপর কোনো সক্রিয় জুলুমবাজির জন্য নয় ; তাদের ধর্মীয় মতামতের প্রতি পরোক্ষভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শনই এজন্য দায়ী। (ঐ , উদ্ধৃত ,পৃ.১৪৫) ভারত বর্ষের ইতিহাস রচনায় উইলিয়াম হান্টার একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ । হান্টার সাহেবের উদ্ধৃতি ঃ " বাস্তবিক, সর্বোচ্চ থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারী কর্মচারী একথা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন যে , আমরা মহারাণীর মুসলমান প্রজাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারিনি। একথা সত্য যে , হিন্দুদের অধিকার স্বীকার করতে হলে মুসলমানরা আর পূর্বের মতো সরকারী চাকরিগুলি একচেটিয়াভাবে ভোগ করবার হকদার নয়। তাদের সম্পদের সাবেক উৎস শুকিয়ে গেছে , সুতরাং এখন তারা নয়া সরকারের অধীনে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণ করতে বাধ্য। .....বর্তমান ইংরেজ সরকারের চাকরিতে এমন একচেটিয়া অধিকার আশা করা মুসলমানদের পক্ষে অন্যায় হবে। কিন্তু এরূপ তো তাদের আবেদনও নয়, অভিযোগও নয়। .....তাদের দুঃখ এই যে, অন্ততঃ বাংলাদেশে তাদের ভাগ্যে কোনো সুযোগই মেলে না। সোজা কথায়, মুসলমানরা হয়েছে বিরাট ও গৌরবময় অতীতের অধিকারী, কিন্তু হালফিল একেবারে জীবনোপায়শূন্য।"(ঐ .পৃ. ১৪৫-১৪৭)

বাংলায় মুসলমানদের অবস্থান প্রসঙ্গে হান্টার সাহেব আরও বলেন ঃ

পূর্ব বাংলার চাষী-বাসিন্দাদের অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান। এই অঞ্চলের জলাভূমি ও নদীবহুল জিলাগুলির আদিম বাসিন্দাদেরকে কখনো ভদ্র হিন্দু সমাজে স্থান দেওয়া হয়নি। দক্ষিণ দিকে আর্যগণ এরকম উপযুক্ত সংখ্যায় উপনিবেম স্থাপন করেনি, যার দ্বারা সাগর-উপকূলের এবং ব-দ্বীপের বাসিন্দাগণকে, পুরাকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের গন্ডিভুক্ত করা যেতে পারতো। এজন্য তারা হিন্দু উচ্চবর্ণেরন গন্ডির বাইরেই থেকে যায়। এই চন্ডালেরা দুরবর্তী সাগরের খাড়িতে মাছ ধরে খেতো এবং বন্যা উপদ্রুত ক্ষেত্রে থেকে অতি কষ্টে ধান জন্মিয়ে ঘরে তুলতো।.....

মুসলমানরা দক্ষিণ অঞ্চল এ রকম বহু পতিত ভূমি আবাদ করে বসতি স্থাপন করেছিল ..... আজও শিকারীরা তাদের কত বাঁধা ডিঙিয়ে, পাকা সড়ক বেয়ে, কত মসজিদ, মাজার, দীঘি পার হয়ে জংগলের নির্ভততম অঞ্চলে প্রবেশ করে - কারণ মুসলমানরা যেখানেই গেছে, সেখানেই ধর্ম প্রচার করেছে কতকটা তলোয়ারের জোরে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষেরই হৃদয়ের কোমলতম দুটো তন্ত্রীতে সজোরে আঘাত কে। হিন্দুরা এই ব-দ্বীপের উভয়চর বাসিন্দাদেরকে কখনো তাদের সমাজে স্থান দেয়নি। মুসলমানরা ব্রাহ্মণ ও নীচ জাত-নির্বিশেষ ইসলামের পূর্ণ অধিকার মুসলমান। নিম্নবংগে ইসলাম এমন দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে যে, এখানকার মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় সাহিত্য ও ভাষা পর্যন্ত গড়ে ফেলেছে। তাদের পুঁথি বা মুসলমানী বাংলা উত্তর ভারতের উর্দু থেকে ততোটা পৃথক, যতোটা উর্দু ভাষা হিরাতের ফারসী ভাষা থেকে পৃথক। এ অঞ্চলের দেহাতী বাশিন্দাদের মধ্যে বহু আশরাফ ও বিশিষ্ট ভদ্র এবং অগণিত ভূ-সম্পত্তির মালিক ও আছেন। একথা সত্য যে, আজও একাকালে অশেষ ক্ষমতাবান সর্বগ্রাসী মুসলমান উচ্চ সম্প্রদায়ের ছিটে-ফোঁটা সারা বাংলা জুড়ে রয়েছেন। তাঁরাই তাদের বিগত দিনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আজও মুর্শিদাবাদে একটা মুসলমান রাষ্ট্রের অনুকারী দরবারের অভিনয় চলে এবং প্রত্যেক জিলাতেই কোনও না কোনও শাসকের দুরবর্তী বংশধর তার ছাদবিহনী বালাখানায় ও জলদামশোভিত সায়রে অপ্রসন্ন গর্বিত দৃষ্টি মেল দিন কাটায়। এ সব পরিবারের অনেকগুলিই আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত।

তাদের ভেঙ্গে পড়া বালাখানাগুলি আজ শুধু বয়স্ক ছেলেমেয়েতে, পৌত্রপৌতীতে, ভাইপো-ভাইঝিতে পূর্ণ এই অন্নবসনক্লিষ্ট ছেলেমেয়ে দলের কাও আজ জীবনে কিছু করবার মতো সুযোগসুবিধা নেই। তারা আজ জোড়াতালি দেওয়া বারান্দায় অথবা ছাদফুটো দহলিজে বসে বসে উদ্দেশ্যবিহীন জীবন যাপন করে, আর দিনে দিনে দারুন হতাশায় দেনার গভীর গহবরে ডুবে যায়। তারপর একদিন প্রতিবেশী হিনট্দু মহাজন ঝগড়া বাধায়, আর কতকগুলি বন্ধকী খতমুলে তাদের ভূসম্পত্তিগুলি আটক করে ফলে, বহু দিনের বহু প্রাচীন মুসলমান পরিবারটি উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলার মুসলমানরাই ১৭৫৭ সাল থেকে তাদের পতন যুগের শিকার হয়েছে। ইংরেজরা ভারত বিজয় করে ১৮৪৯ সালে, শিখদের পরাজিত করে মুলতান ও পাঞ্জাব বিজয়ের ফলে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ ইংরেজদের দখলে আসে ১৭৫৭ সালের পর ১৮৪৯ সালের আগেরকার সময়টুকুর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে। বাংলার মুসলমানরা তাই ইংরেজ ও তাদের অনুগ্রহ নির্ভর হিন্দুদের হাতে লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়েছে অনেক বেশী সময় ধরে। এটুকু স্মরণ করেই চলুন আবার হান্টার সাহেবের কথায় ফিরে যাই।

আমি এখানে মুসলমান চাষী ও মুসলমান বড়-ঘরানাদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করলাম যাতে ইংরেজরা যেন চোখ খুলে দেখতে পায়, কোন শ্রেণীর লোকদের অভিযোগ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। আমি এখানে আরও বলে রাখি যে, আমার মন্তব্যগুলি কেবল বাঙলা দেশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কারণ আমি এদেশটাই ভালোমত জানি এবং আমার যতদুর জানা আছে, তাতে ধারণা হয়ে যে, এদেশের মুসলমানরাই বৃটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ... যদি কোন মানুষ কখনো জীবনোপায়ের জন্য তীব্র প্রয়োজনীয়তা বোধ করে থাকে তাহলে সে হচ্ছে বর্তমান কালের বাঙলার খান্দানী মুসলমান। ''

এরপর হান্টার সাহেব বলেছেন, কি করে মুসলমানরা সেনাবাহিনী, রাজস্ব বিভাগ এবং বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ প্রভৃতি বেসামরিক চাকরি থেকে একেবারেই বাদ পড়ে গেল। তারপর তিনি প্রশ্ন রেখেছেন।

এ সবের কারণ কি? হিন্দুরাই কি মুসলমানদের চেয়ে বেশী উপযুক্ত এবং পাল্লায় হারিয়ে দেওয়ার জন্য কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্রেরই কি অভাব ছিল, কিংবা মুসলমানদের জন্য আরও বহু জীবনোপায় খোলা থাকর দরুন তারা সরকারি চাকুরী-জীবন পছন্দ করে না এবং এজন্য হিন্দুদেরকে খোলা ময়দান ছেড়ে দিয়েছে? হিন্দুদের উচ্চ বুদ্ধিমত্তা আছে স্বীকার করি। কিন্তু তাদের সার্বভৌম ও অপরিসীম শ্রেষ্ঠতাই তাদেরকে সরকারি চাকরিতে একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে, বর্তমানে তেমন কিছু নযরে পড়ে না এবং এ রকম যুক্তিও তাদের অতীত ইতিহাসের সম্পুর্ণ বিপরীত। আসল সত্য এই যে, যখন এ দেশটা আমাদের অধিকার আসে। তখন মুসলমানরা ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি, তারা শুধু দরাজ দিল ও সবল বাহু নিয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল না, তারা সরকারী গঠনমূলক কাজে এবং শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত হাতে-কলমের বিদ্যায়ও ওস্তাদ ছিল। তবু আজ মুসলমানদেরকে সরকারি চাকরি ও বেসরকারি কাজকর্ম থেকে সমানভাবে দুরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।''

১৭৫৭ সালের যুদ্ধের পর এদেশের পুরাতন যে সমাজটা ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা ধ্বংস করে দিল, তা হলো মুসলমান সমাজ। পুরাতন হিন্দু সমাজটাও ভেঙে দিয়েছিল ওরা, কিন্তু তার স্থলে একটা আধুনিক হিন্দু সমাজ তারা গড়ে তুলতে সর্বরকমে সাহায্য করেছিল। মুসলমানদের বেলায় কোন 'আধুনিক' সমাজ গড়ে তোলার কোন সদিচ্ছাও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের ছিল না। আর 'বিভক্ত করে শাসন কর' নীতিতে সেটা স্বাভাবিক ছিল না। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, 'বিদ্রোহী' মুসলমানদের তো কথাই নেই, 'শান্তিতে ইংরেজ শাসন মেনে' নিয়েছিল যে সব মুসলমান তাদের প্রতি অবিচারের কথাই বলেছেন হান্টার সাহেব - বৃটিশ সরকারের এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী।

নতুন গড়ে ওঠা বর্ণহিন্দুদের ওই আধুনিক হিন্দু সমাজটাই সর্বাংশে সহায়ক হয়েছিল এদেশে থেকে বিশ্বজনগণের স্বাধীনতার নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল, তিনিই আবার নীলকর সাহেবদের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন । তিনি এদেশে নীল, পাট, চা, চিনি প্রভৃতি কৃষিশিল্পে ইংরেজ নন্দনদের আরও বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণের নীতি সমর্থন করেছিলেন । তার ফলে এদেশের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির তুলনায় অনেক বেশী উনইত হয়েছে এ দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির ; কারণ তার ফলে এদেশ সম্পর্কে 'অনভিজ্ঞ'

সাহেবরা কাজ চালিয়ে নিত এদেশীয়দের সাহায্যেই এবং তার জন্য তো মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি আছেই! অবশ্য, এর থেকে মুনাফার মোটা অংশটা যেত সাগর-পারে, কিন্তু সরু অংশটা অন্তত তেকে যেত সাহায্যকারী 'মধ্যবিত্ত নেটিভ'দের ভাগে। এই অংশটার ষোল আনাই গ্রাস করত বাঙ্গালী হিন্দুরা। ''তারা প্রথমে নগণ্য সেবকদের মতো বেনিয়ার, মুৎসুদ্দি, দালাল, গোমস্তা, প্রভৃতি নামাঙ্কিত হয়ে ইউরোপীয় হাউসে প্রবেশ করতো, ব্যবসার ফন্দি কৌশলগুলো আয়ত্ত করতো, তারপর নিজেরা সামান্যকারে ব্যবসা ফেঁদে বসতো। এ ভাবেই রামদুলালদের পুত্র আশুতোষ দে চার্লস কান্টর কোম্পানীর রেলি ব্রাদার্সের বেনিয়ার হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন। এভাবে বিখ্যাত ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ জয়রাম আমিনগিরি করে প্রথমে অন্নসংস্থান করতেন; তার পৌত্র দ্বারিকানাথ প্রথম নিমকী সাহেবের শেরেস্তাদারী করেছিলেন, কিন্তু পরে প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর হিসেবে ব্যবসায় ও জমিদারীতে জ্যোতিষ্করূপে গণ্য হতেন।

১৮৩৫ সালের বেঙ্গল ডাইরেক্টরীতে দেখা যায়, কলিকাতা চেম্বার অব কর্মাসের শাসন-পরিষদে তিনিই একমাত্র ভারতীয় সভ্য।" অরবিন্দ পোদ্দারের মতে , বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিই ছিল ইংরেজদের এদেশ দর্শন-শ্রবণের চক্ষু কর্ণ; ইরেজদের নিকট এদেশের গণ ও সমাজ জীবনের সেতুবন্ধ স্বরূপ। ভারতীয় সমাজ, সমাজ-জীবন, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের পাঠ এরাই ইংরেজদের সরবরাহ করতো; আর বৈষয়িক এবং শাসন কার্যাদির ব্যাপারে ইংরেজকে এদের উপরেই নির্ভর করতে হতো। (উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পৃষ্ঠা - ১০) ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ বি.বি. মিশ্রের মতে, এই স্বার্থ সংরক্ষণের গরজটা ইংরেজ ও এই শ্রেণীর হিন্দু মধ্যবিত্তদের এতোখানি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল যে, ১৮৮৮ সালে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেনীর প্রতিষ্ঠিত ' ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে চক্ষু লজ্জায় বাধেনি (The Indian Middle Class; Their Growth P. 105) আবদুল মওদুদের কথায়, '' কোম্পানী আমলের একশো বছরের বাণিজ্যিক গতি-প্রগতির ইতিহাস অনুধাবন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, কি স্বার্থের ডোরে ইংরেজরা এবং এদেশের এক শ্রেণীর বর্ণহিন্দু সন্তানেরা বাঁধা পড়েছিল এবং অনুগ্রাহক সাহেববৃন্দ অনুগৃহীত 'নেটিভ্দের' মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে রূপায়িত করেছিল।

সাম্রাজ্য স্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থানায় ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দান করে বাংলার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তানদের নিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপ সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এমনকি এই লৌহ খুঁটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রাজা রামমোহন নামও স্মরণীয়। কৌতুককর এই যে, তখন ব্যবায়ে যারা এতোখানি ভাগ্যে নির্মাণ করেছিলেন, সেই রামমোহন রায়, রামদুলাল দে, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, আশুতোষ দে, রামগোপাল ঘোষ, কারও বংশগত পেশা ব্যবসায় ছিল না। কিন্তু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ যুগের বর্ণ হিন্দুরা ইংরেজের শাসন মনে প্রাণে গ্রহণ করে ইংরেজের পরম খায়ের খাঁ হয়ে উঠেছিল।'' একই কথার ধ্বনি শুনি অরবিন্দ পোদ্দারের বক্তব্যেও ঃ ''এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বৃহদাংশ ইংরেজ শক্তির আবির্ভাবকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিল। '' (উনবিংশ শতাব্দীর পথিক পৃ. ১০-১১)

লুণ্ঠনের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজের কীর্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল। এবার ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দৃষ্টি ফেরানো যাক। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ' গ্রন্থে আবদুল মওদুদ সাহেব বলেন ঃ

মুঘল যুগে ভূম্যাধিকারীদের ক্রম স্তর ছিল এরূপ জমিদার, তালুকদার, মকররীদার, ইজারাদার প্রভৃতি। তালুকদারের সংখ্যা ছিল বেশী, এবং বাংলা, বিহার, গুজরাট, মাদ্রাজ সর্বত্র তাঁদের অস্তিত্ব ছিল । ..... যেখানে জমিদার, তালুকদার ছিল না, সেখানে ইজারাদার নিযুক্ত হতো রাজস্ব কর্মে।

ইংরেজদের প্রথম কাজ ছিল, জমিদারের বিচার ও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে নিজেদের হস্তে গ্রহণ করা। প্রথমে বিবেচিত হওয়ায় প্রথমত ইজারা প্রথায় রাজস্ব আদায় করা হতো। ..... ১৭৭২ সালে হেস্টিংস ইজারাদারী পাঁচসালা বন্দোবস্ত দিতেন। তালুকদার ও ক্ষুদ্র জমিদারদের সংগে সরাসরি রাজস্ব-ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জমিদার ফৌৎ হলেই তার জমিদারি ভেঙ্গে কয়েকজন ইজারাদার নিযুক্ত হতো। ..... ইজারা প্রথায় জমিদারদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় এবং ঘরানা জমিদারগুলো ভেঙে পড়তে থাকে।

ইজারা বিলি নিলাম ডাকে আরম্ভ হওয়ায়, ভূমি ক্ষেত্রে বাজার গরম হয়ে উঠে এবং ফটকাবাজি চলতে থাকে। যতো বেনিয়ান, মুৎসুদ্ধি, সরকার, গোমস্তা ব্যবসায়ে উপার্জিত অঢেল অর্থ ভূস্বত্বে খাটাতে থাকে এবং এভাবে ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্তদের উদ্ভব হয়। ইজারাদারীর মুনাফা এতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠে যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা বেনিয়ানদের সহযোগে ভূমি রাজস্বের মুনাফা লুটতে থাকে। ..... ১৮৭৬ সালে ..... কোর্ট অব ডিরেক্টরর্স স্বীকার করেন, ভূমির বন্দোবস্তে ব্যবসায়ীরা প্রবেশ করেছে এবং বেআইনীভাবে কোন কোন জিলা প্রশাসক বেনিয়ানদের বেনামীতে ভূমিস্বত্ব অর্জন করেছেন। এমন কি গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংসের স্বার্থে তাঁর বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী আপন পুত্র লোকনাথ নন্দীর নামে বহরবন্দ পরগণায় বহু ভূ-সম্পত্তি ইজারা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত নতুন ইজারা নীতির ফলে পুরাতন অভিজাত শ্রেনীর জমিদার গোষ্ঠীত ভাঙন ধরে গেলো এবং নব্য বেনিয়ানরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে লাগলো।

১৭৭০ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলা ও বিহারের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করে এবং বহু গ্রাম জনহীন হয়ে যায়। এর অভিঘাত পড়ে কৃষিকার্যে তথা রাজস্ব আদায়ে ; কৃষকের অভাবে জমি অনাবদী থেকে যায় এবং খাজনাদিও আদায়ওয়াশীল শক্ত হয়ে পড়ে। অথচ হেস্টিংস কড়া চাপে কোম্পানীর প্রাপ্যটা নির্ধারিত অংকেরও বেশি আদায় করেছেন। তার ফলেও বহু প্রাচীন জমিদার হয় ফৌৎ হয়ে যান অথবা দারিদ্র্যের কবলে পড়েন। অনেকেরই জমিদারী নিলামে উঠে ও নামেমাএ মূল্যে বিক্রয় হয়ে যায়। ..... এই সময়ই পায়কশ্ত্ কৃষক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, তারা অস্থায়ী কৃষক হিসেবে গণ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে হলকর্ষক ছিল না ; যেমন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক সুবিধায় বহু জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।

বাংলায় প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে কোম্পানীর রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের বহু নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীর দল। তারা কৌশলে বহু জমির নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত হাসিল করতো। নদীয়া জেলার এজন আমীন স্বনামে বহু জমির জমাবন্দী নিজ নামে প্রস্তুত করে ও সেসব বিনা সেলামী ও বিনা বন্দোবস্তে আত্মসাৎ করে। অথচ সেগুলো স্বীকৃতিও লাভ করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ জয়রাম। তিনি বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ। আমীন হিসাবে তিনি কোম্পানীর চব্বিশ পরগনা জিলার বন্দোবস্ত কার্যে নিযুক্ত থাকাকালেও প্রভূত ভূমির মালিক হন।.....

যাহোক,হেস্টিংসের পাঁচসালা ইজারা বন্দোবস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।.....কর্নওয়ালিশ এলেন ১৭৮৬ সালে। স্যার জন শোয়ের সুপারিশক্রমে প্রথমে তিনি ১৭৯০ সালে জমিদারগণের (নতুন) সংগে বন্দোবস্ত করলেন দশসালা নীতিতে । জমিদারদের স্বত্ব ওয়ারিসী হিসেবে স্বীকৃত হলো। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের অনুমোদন লাভ করে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হিসেবে ঘোষিত হলো ১৭৯৩ সালে। বাৎসরিক নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ার চুক্তিতে জমিদারদের স্ব স্ব চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য স্বীকৃত হলো। সহসা(নতুন) জমিদারগোষ্ঠী ভূমির মালিক হয়ে গেলেন, হতভাগ্য কৃষক শ্রেনী তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল।

এভাবে পুরাতন জমিদার শ্রেনীর বদলে ইংরেজের আশীর্বাদপুষ্ট নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেনী জমিদার তালুকদার হিসেবে প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেন।তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রে কলিকাতা বা অন্য শহর এলাকাবাসী ; এজন্য অনুপস্থিত অন্যত্রবাসী জমিদার শ্রেনীতে বাংলা ভরে গেল। (পৃ.৮৫-৯০) । উইলিয়াম হান্টারের মতে,"এই বন্দোবস্তের ফলে যে সব হিন্দুরা নগণ্য পদে নিয়োজিত ছিল, তারা জমিতে মালিকানা স্বত্ব লাভ করলো, এবং পূর্বে যে ধন মুসলমানের ঘরে যেতো সেসব হিন্দুরা আত্নসাৎ করতে লাগলো।"(ঐ .উদ্ধৃত,পৃ.৯১) । তিনি আরও বলেন,".....আবার ত্রিশ বছর পরে বাজেয়াফ্তী আইন তাদের ভাগ্য একেবারে ওলটপালট করে দিল।.. .....এই আইনের জোরে মালিকানা স্বত্বের দলীল দস্তাবেজগুলির বড়ো কঠোর ব্যাখ্যায় কেবল রাষ্ট্রেরই মুনাফা বাড়ানো হয়েছিল;অথচ মুসলমানরা নিজেদের আমলদারীতে এ-সবের কোনো ধার ধারতো না। গত পঁচাত্তর বছরের বাঙলার মুসলমান পরিবারগুলি হয় উৎখাত হয়ে গেছে, না হয় আমাদের শাসন আমলের নয়া সমাজের নিম্নস্তরে চাপা পড়ে যাচ্ছে।"(ঐ,পৃ.১৬০)। বাজেয়াফ্তী আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে হান্টার সাহেব বলেন ঃ

আমরা বাঙলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করলে পর সমকালীন সুযোগ্য রাজস্ব কর্মচারী হিসাব কষে দেখলেন যে, সমগ্র দেশের সিকি ভাগউ রাষ্ট্র থেকে দানের খাতে চলে গেছে। ১৭৭২ সালেই ওয়ারেন হেস্টিংষ এই সাংঘাতিক ফাঁকিটা ধরে ফেলেন; কিন্তু সে-সব জোত বায়েজয়াফ্ত করার বিরুদ্ধে জনমত তখন এতোই প্রবল ছিল যে ,কোনও সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস পুনরায় সরল ও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, যে -সব নিষ্কর জোত-স্বত্বের পক্ষে শাসন শক্তির মঞ্জুরি নেই সেগুলিকে বাজেয়াফ্ত করার সরকারের নিরংকুশ ক্ষমতা রয়েছে; কিন্তু তখনকার শক্তিশালী সরকারও এই নীতি কার্যকরী করতে সাহসী হয়নি।-----১৮১৯ সালে এই দাবীটা আরও একবার ঘোষিত হলো, কিন্তু তখনও কার্যকরী করতে সংকোচবোধ করা হলো। শেষে ১৮২৮ সালে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা -পরিষদ একযোগে একটা জোরালো পন্থা অবলম্বন করতে অগ্রসর হলো। এজন্য বিশেষ আদালত বসানো হলো, আর তারপর পুরো আঠারো বছর ধরে সারা প্রদেশটা সংবাদদাতা, মিথ্যুক সাক্ষী এবং নির্দয় ও কঠোর বাজেয়াফ্তী কর্মচারীতে ভরে গেলো। বাজেয়াফ্তী মামলাসমূহে এক কোটি টাকারও বেশি মূলধন খরচ করে সরকারের স্থায়ী অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ালো মোটামুটি চল্লিশ লক্ষ টাকার উপর ; অর্থাৎ প্রায় আট কোটির টাকার উপর সালিয়ানা শতকরা পাঁচ টাকা মুনাফা লাভ হলো। আর এর মোটা অংশ এসেছিল সেইসব লাখেরাজ জমিজমা থেকে যেগুলির মালিক ছিল মুসলমানরা অথবা তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি তার ফলে যে আতঙ্ক ও ঘৃণা জমে উঠেছিল, সে -সব আজও জমা হয়ে আছে পাড়াগায়েঁর দলিল-প্রণালী, যা এতোদিন লাখেরাজ ওয়াকএফর জমিজমার উপর নির্ভরশীল ছিল, মারাত্নক আঘাত পেল। মুসলমান আলীম-সমাজ প্রায় আঠারো বছরের হয়রানির পর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।

যে-কোন নিরপেক্ষ গবেষক এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য যে, বাজেয়াফ্তী আইনগুলির দ্বারা আমাদের বারে বারে বিশেষভাবে রক্ষিত অধিকারসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও এ-সব মামলা ছিল অত্যন্ত কঠোর ও ভারতীয় জনগণের বিশ্বাসের বিপরীত। বহুকালের ভোগজনিত অধিকার পরিষ্কার আইনের বিরুদ্ধে কোনো স্বত্ব সৃষ্টি করতে পারে না সত্য, কিন্তু পঁচাত্তর বছরের অবিচ্ছিন্ন ভোগ দখলের অধিকার (পঁচাত্তর বছর হয় ১৭৫৭ সাল থেকে দখলকারীদের ছিল) সরকারের অনুগ্রহের উপরেও সবল দাবি জানাতে পারে। কিন্তু আমাদের বাজেয়াফ্তী কর্মচারীরা (হিন্দু) দয়ামায়ার ধার ধারতো না। তারা অবিচীরতভাবে আইনই প্রয়োগ করেছে। সে সময়ের আতঙ্ক আজও জেগে আছে, আর আমাদের ভাগ্যে রেখে গেছে সুতীব্র ঘৃণার উত্তরাধিকার। তারপর থেকেই শিক্ষকতার পেশা , যা দেশীয় শাসকদের আমলে বেশ সম্মান ও মোটা আয়ের জীবনোপায় ছিল, বাঙলা দেশে একবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মুসলমানদের ওয়াকফ্গুলিই মার খেয়েছে সবচেয়ে বেশি; কারণ, অন্যান্য বিষয়ের মতো স্বত্বের দলীল দস্তাবেজ সম্বন্ধে ভারতের

পূর্বতন বিজেতাগণ এ রকম উদ্ধত উপেক্ষা দেখাতো , যা হিসেবী ও সুচতুর হিন্দুর নিকট অজ্ঞাত। লাখেরাজ জোতস্বত্ব সম্বন্ধে আমরা এমন ধরনের উপযুক্ত প্রমাণ দাবি করেছিলাম, যা তখনকার স্থাবর সম্পত্তির অনির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে নিজ নিজ সম্পত্তির প্রমাণের জন্য উপস্থিত করতে তারা একেবারেই অসমর্থ ছিল। .....যে-সব স্বত্বের দলীল ও সনদ এ-সব দাবির প্রমাণ ছিল, ইতিমধ্যে সেগুলিকে দেশের আবহাওয়ায়ও উইপোকায় ধ্বংস করে ফেলেছিল। .....এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বাজেয়াফ্তীকরণের সময় থেকেই মুসলমান শিক্ষা-প্রণালীর অবসানও সূচিত হলো। ...বাজেয়াফ্তী মামলাগুলিকে ন্যায়সংগতভাবে হয়তো সমর্থন করা যেতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষা-বিষয়ক মূলধনগুলি আমরা আত্মসাৎ করেছি বলে তারা যে অভিযোগ তোলে, তার বিরুদ্ধে কোনো সমর্থন খাড়া করতে পরিনে। কারণ ,এই অভিযোগ তোলে, তার বিরুদ্ধে কোনো সমর্থন খাড়া করতে পারিনে। কারণ, এই সত্যটা স্বীকার না করার কোনো মানে হয় না যে, মুসরমানরা বিশ্বাস করে, আমরা যদি এই উদ্দেশ্য আমাদের উপর ভারার্পিত সম্পত্তিগুলিকে সাধুতার সংগে কাজে লাগাতাম, তাহলে এই সময়ে বাঙলা দেশে মুসলমানরা সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে কার্যকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকারী থাকতো(ঐ,পৃ.১৭৯-১৮১)।

উইলিয়াম হান্টার কিছু প্রকৃত সত্য কথা বলেছেন,সে গুলোর বিস্তারীত আলাপ আজকের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হয়। শুধু মুসলিম প্রতিষ্ঠান সমুহের জন্যে মুসলিম স্বাধীন সুলতান ও মোগল সম্রাট গণ কতৃক লাখেরাজ কৃত ভূসম্পত্তিগুলো গেলো কোথায় সে কথা জানার জন্যে লেখক উইলিয়াম হান্টারকে উদ্ধৃত করেছেন। চাঁদপুর সদর উপজেলার শাহাতলী গ্রামে হজরত শাহ মাহমুদ বোগদাদী (র) এর নামে বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) কর্তৃক নিস্কর ভুমির ব্যাপারটি উল্লেখ করা যায়। শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ বোগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্যে আগত হজরত শাহ মাহমুদ বোগদাদীকে, শাহতলী মৌজার (করদি পরগনা) অংশবিশেষ তার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করার জন্যে নিস্কর ভুমি হিসেবে দান করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের আমলে এসে ভূমির পরিমাণ দাড়ায় ১৯ একর ২২ শতাংশে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জরীপকৃত কাগজের হজরত শাহ মাহমুদ বাদদাদীর (র) পরবতী বংশধরদের বসত বাড়ি, বাগান বাড়ী ও নাল সম্পত্তি সহ মোট ১৯ একর ২২ শতাংশ জায়গা চিরস্থায়ী বন্দোস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে তাতে ১৯/- কর আরোপ করা হয়। শাহমাহমুদ বোগদাদী বংশধরগণ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারে বিপক্ষে মামলা করলে, ইংরেজ সরকার ৫ একর ১২ শতাংশ জায়গা নিস্কর রেখে বাকী সম্পত্তির ওপর কর আরোপ করে। জানা যায়, পরবতী সময়ে ১৯ একর ২২ শতাংশ ১৯৪৫ সালে সরকার কর মুক্ত করে দেয়। হজরত শাহমাহমুদ বোগদাদীর বংশধরগণ এক সময় শাহাতলী ও ভরংগাছচরে গ্রামের ২২টি বাড়ি কর ছাড়াই ভোগ করতেন।

২৯ আগস্ট ২০০৫ লেখক ও তদীয় পুত্র রাজীব হাজীগঞ্জ থানার উত্তর দিকের গ্রাম সুহিলপুরে আসেন, বোয়ালজুরি কালের পশ্চিম পাড়ে সুহিলপুর মিয়াজী বাড়ী একানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিলো। মসজিদটি ভুমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মসজিদটি ছাদ সম্পূর্ণ ধ্বংশ হয়ে যায়। ১৯৫৯ সনে জনৈক সুফী আবু মিয়া এ অঞ্চলে আসেন। তিনি এখানে এসে স্থানীয় এক পরিবারে বিয়ে করেন। তার বংশধরা এখনো সুহিলপুর গ্রামের মিয়াজী বাড়িতে বসবাস করছেন। সুফী আবু মিয়া রাজ কর্মচারী ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি মসজিদটির দেওয়াল গুলোর সংস্কার করেন। ছাদ হিসেবে কাঠ ও ছনের ব্যবহার করেন পরবতী সময়ে স্থানীয় লোকজন মসজিদটিতে টিন এর ছাদ তৈরী করে, মসজিদটি ব্যভহার করতে থাকেন। ১২৯৯ সনের বন্যায় মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে স্থানীয় লোকজন এটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে নতুন আধুনিক একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। লেখক মিয়াজী বাড়ীর শতাধীক বৎসরের প্রবীন একজন ভদ্রলোক জনাব আহমেদ আলীর সাথে আলাপ করেন। আহমেদ আলীর পিতা মরহুম হাজী দাইম উদ্দিন মিয়াজী, যিনি শতবৎসর বেঁচে ছিলেন তার কাছে আহমেদ আলী মিয়াজী

শুনেছেন এই মসজিদটি একবার মাটিতে সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছিলো ১৬৫৯ সনে তার পূর্ব পুরুষ এটিকে মাটির নিচ থেকে উদ্ধার করে দেখতে পান এখানে একটি মেহেরাব রয়েছে দেওয়াল গুলো ৪ ফুট প্রস্থ। এখানে একটি শিলা লিপি ছিলো। বাড়ির অপর বাসিন্দা সুহিলপুর মাদ্রাসার অধক্ষ্য মাওলানা ছেফায়েত উল্লঅহ জানান তিনিও শিলালিপিটি দেখেছিলেন পরবর্তী সময়ে নতুন মসজিদ নির্মাণ কালে অসর্তকতার জন্যে মুল্যবান শিলালিপিটি হারিয়ে গেছে। সুহিলপুর এসে লেখক জানতে পারেন জনৈক মুসলিম রাজ কর্মচারী পার্শ্ববর্তী গ্রামে একটি দিঘী খনন করেছেন যার গভীরতা এতই বেশি লোকজন এটিকে দরিয়ায়ে হায়াত বলে। এখনো এই দিঘীটি বর্তমান রয়েছে।

২রা সেপ্টেম্বর লেখক ও তার ছোট ছেলে হাজিগঞ্জ থানার উত্তর পশ্চিমের একটি অখ্যাত পল্লী ফিরোজপুর পরিভ্রমন করেন। তিনি এসে দাড়ান অনিন্দ্য সুন্দর একটি দিঘীর পাড়ে। দিঘীটির চতুপার্শ্বে বহু বাড়ি ঘর। দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম কোনে সুন্দর এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ, এই মসজিদটি ১৩৪৪ খ্রীষ্টিয় সনে দেওয়ান ফিরোজ খান লস্কর তার খনন করা দিঘীর পাড়ে নির্মাণ করেছিলেন। আটটি শতাব্দীর অনেক ঝড় ঝাপটা সয়েও মসজিদটি আজো সুন্দরভাবে দাড়িয়ে আছে। মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন মহান সাধক ও শাসক দেওয়ান ফিরোজ খাঁন লস্কর। স্থাপিত মসজিদের পাঁচশত গজ দক্ষিণ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ফিরোজ খাঁন কর্তৃক খনন করা একটি খাল। এটি হাজিগঞ্জ উপজেলার ধড্ডা গ্রামের পুর্ব পার্শ্বের বোয়াল জুরি খাল থেকে বাজারগাঁও হয়ে মতলব উপজেলার পুর্ব পার্শ্বে ধনাগোদা নদীতে গিয়ে মিশেছে। খালটিকে লোকজন এখনো ফিরোজ খানের দাঁড়া বলে। স্থানীয় লোকজন নৌপথকে নৌদাঁড়া বলে। নৌপথটি এখনো যতেস্ট নাব্য রয়েছে দেওয়ান ফিরোজ খান লস্করের অমর কীর্তি দিঘী ও মসজিদের।

মসজিদে লেখক দু'রাকাত নফল নামায আদায় করলেন, ভাবলেন ১৪৯৯ সনে ক্রিষ্টোফার কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিস্কার করেছিলেন তখন আমেরিকা ছিলো প্রায় জনমানব শূণ্য গুটিকয়েক জঙ্গালবাসী রেড ইন্ডিয়ানের আবাসভুমি। আমেরিকা আবিস্কারের দেড়শতাধীক বছর আগে, ফিরোজপুর গ্রামে দেওয়ান ফিরোজখান লস্কর এত সুন্দর দিঘীও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা আজো বর্তমান। পূর্ব পুরুষের ঐশর্য আর ঐতিহ্যকে ভুলে আমরা কোথায়? মুসলিম স্বাধীন সুলতারা নৌযোগাযোগ আর সেচ কার্য এবং জলাবদ্ধতা দুর করার জন্যে খনন করেছিলেন অনেক খাল পানীয় জলের জন্যে জলাশয়। অথচ তাদের অধ্বস্তন পুরষ আজ হতদারিদ্র- সেদিনের অসভ্য আমেরিকান জাতির সাহায্য প্রত্যাশী। দিঘীটির আয়তন পাঁচ একর। মসজীদের দক্ষিণ পার্শ্বে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মোয়াজ্জেব হোসেনের কবর রয়েছে। ১৩৮৪ বাংলা সনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তার পিতা মৌলভী ওয়াজ উদ্দিনও একজন উঁচু পর্যায়ের আলেম ছিলেন।

মসজীদের দরওয়াজার ওপরে আরবী ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি সাঁটানো রয়েছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় মসজিদটি রাজকীয় অর্থে নির্মাণ করা হয়েছে। তখন বাংলার শাসক ছিলেন সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯) । সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ ফকীর-দরবেশগণকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ১১ বছরের রাজত্ব কালে যাকীর দরবেশগণ নানা রকম সুযাগ সুবিধা ভোগ করতেন। সোনারগাঁও রাজ্যে নৌকাযোগে তাঁদের ভ্রমণে কোন পয়সা কড়ি লাগতো না। এমনিক সুলতানের নির্দেশক্রমে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় হাত-খরচাও দেওয়া হতো। সুলতান ফখর উদ দীন মুবারক শাহের আমলের অন্যতম দু'টি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা বিখ্যাত পারিব্রাজক ইবনে বতুতার বাংলা ভ্রমণ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলকে সোনারগাঁও রাজ্য ভুক্ত করা। ইবনে বতুতা নৌপথে সিলেট হজরত শাহজালালের সাথে দেখা করে ছিলেন। নদী বহুল বাংলাদেশে নৌপথ ব্যবসা বাণিজ্য ও সেনা চলাচলের প্রধান মাধ্যম ছিলো। এক

নদী থেকে অন্য নদীরেত যাওয়ার জন্যে বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ সংক্ষিপ্ত পথ হিসেবে সংযোগ খাল নির্মাণ করেছিলেন। বোয়ালঝুরি ও ফিরোজ খানের (দাঁড়া) তেমনি দু'টো সংযোগ খাল।

৩রা সেপ্টেম্বর ২০০৫ লেখক তার বড় ছেলে সজীবকে নিয়ে চাঁদপুর জেলা সফর থেকে ১৪ কিঃ মিঃ পূর্ব দিকে, ডাকাতিয়া নদীর একটি বাঁকে আসে। এখানে নদীর কোলঘেষে সুন্দর একটি গ্রাম নাম ছোট সুন্দর। গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি হগঞ্জ বা ব্যবসা কেন্দ্র। ব্যবসা কেন্দ্রটি বর্তমানে পাকা সড়ক দিয়ে জেলা সদরের সাথে সংযুক্ত । গ্রামের পরিবেশটা খুব মনোরম। তখন অপরাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়া শুরু করেছে। ছোট সুন্দর বাজারে লাগ উত্তর দিকে একটি বিশাল বাড়ি, ছোট সুন্দর তালুকদার বাড়ি। পাঁচশত গজ উত্তর পূর্ব কোণে একটি মাঝারি আকারের দিঘী। দিঘীর চর্তুদিকে জলবসতি নেই। পূর্ব দক্ষিণ কোনে একটি বিরাট ঝোপ কেউ বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই, এই ঝোপের মধ্যেই একটি প্রাচীন প্রত্নসম্পদ লুকিয়ে আছে। অনিন্দ্য সুন্দর এক গম্বজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ।

লেখক ছবি তোলার জন্যে সাথে কেমেরা নিয়েছিলেন। কিন্তু ঝোপের জন্য মসজিদটির ছবি তোলা সম্ভব হয়নি।

সন্তান ও সাথী রিকশাওয়ালার আগ্রহে আতিশায্যে লেখক এক হাঁটু পানি ভেঙ্গে , ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করে অবাক বিস্ময়ে দেখতে পান একটি ছোট মসজিদ, গম্বুজটি অটুট রয়েছে দেওয়াল গুলো চল্লিশ ইঞ্চি প্রস্থ। মেহেরাব ও বাতি জ্বালানোর জন্যে নির্মাণ করা কার্ণিশ রয়েছে এখানো অটুট রয়েছে। ইমাম সহ একসারিতে সর্বোচ্চ সাতজন মানুষ নামাজ পড়তে পারে। লেখকের মনে হয়েছে, বাংলার মুসলিম স্বাধীন সুলতানদের আমলে নির্মিত এটি সবচাইতে ছোট মসজিদ।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে লেখক স্থাপনাটির পুর্বদিকে চারশত গজ দুরের একটি বাড়িতে যান, বাড়িটির নাম ভাগের বাড়ি। সে বাড়ির সবচাইতে প্রবীন ব্যক্তি জনাব ইউসুফ আলী (৯২) পিতা মরহুম ওয়াজ উদ্দিন মিজি এর সাথে লেখকের আলাপ হয়। ইউসুফ আলী মিজি এর সাথে লেখকের আলাপ হয়। ইউসুফ আলী মিজি জানান, তার পিতা ওয়াজেদ মিজি একশত পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন চল্লিশ বছর আগে মারা গেছেন তার পিতামহ এবং প্রপিতামহ ও দীর্ঘজীবি ছিলেন। এরা সকলেই মসজিদ টিকে এরূপ অবস্থায়ই দেখেছেন মসজিদটির ওপরে একটি বিশাল ঝিরগাছ ছিলো। ঝিরগাছের শিকড় নেমে মসজিদটি ঢেলে গিয়েছিলো ফলে বিগত দুই শতাব্দিতে কোন মানুষ এখানে নামাজ পড়েনি। শতাব্দির পর শতাব্দি মসজিদটি অনাবাদি রয়েছে। চার বছর আগে তালুকদার বাড়ির এক ব্যক্তি গাছটি কেটে লাকড়ি করে বিক্রিকরে দিয়েছে। অনুসন্ধান করে লেখক জানতে পারেন বিশালাকার কেটে পাঁচশত মন লাকড়ি পাওয়া গিয়েছিলো। গাছের শিকড় (ঝুর) মসজিদটির চারপাশে এমনভাবে নেমেছিলো স্থানীয় লোক জনের ধারনা জন্মেছে মসজিদটি গাছটির পেঠ থেকে বের হয়েছে। গাছটি কাটার পর তালুকদার বাড়ির লোকটি স্ত্রী ও নিকট আত্মী হঠাৎ করে মারা যায়, ফলে ভয় পেয়ে লোকজন মসজিদটির সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়নি। স্থানীয় প্রবীন ব্যক্তি আঃ হালিম (৮২) লেখককে জানান তিনি শুনেছেন আটশত বছর পূর্বে সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমলে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে একটি পুরাতন কবরস্থানছিলো, এখনো পুরানো কবর আছে। কোন ব্যক্তি হয়েতো স্বজন হারানোর ব্যাথায় কবরস্থান সংলগ্ন এই ছোট এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রয়াত স্বজনের আত্মার মুক্তির জন্যে মসজিদে এবাদত করতেন। দেশ ও জাতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ কল্পে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ মসজিদটি সংস্কারের উদ্যোগ নিতে পারে। ছোট সুন্দর বাজারে এসে আলাপ করে লেখক জানতে পারেন এলাকার লোকজন মসজিদটি সম্বন্ধে অবহিত । লোকজন জানালো বিগত দু'শতাব্দিরও অধিকাল মসজিদটি

অনাবাদি রয়েছে। যে আল্লাহ ভক্ত মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন, তার পরিচয় কালের গতিময় চক্রে কোথায় হারিয়ে গেছে আমরা জানিনা। তিনি কে ছিলেন তাও আজ আর জানার ওপায় নেই।

একটি কথা সকল সময় সঠিক ধরণীর বুকে চিরদিন বেঁচে থাকার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। মৃত্যু চিরসত্য কিন্তু তা জেনেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, মৃত্যুকে আলিঙ্গান করতে চায় না কেউই। রোগ-শোক-জরাকে অতিক্রম করে মানুষ বাঁচার স্বপ্ন দেখে। একটু সহযোগিতা, সহানুভূতি অনেক মৃত্যুপথচারী মানুষকে দিতে পারে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার আশা। তারপরও অসহায় মানুষগুলো সহমর্মিতার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। একদিন অবধারিত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। চোখের অন্তরাল হয়ে যাওয়া প্রিয়জনের জন্যে তখন অসহায় জীবিত স্বজন সৌধ নির্মাণ করে বানায় তাজমহল, পিরামিড অথবা কোন মসজিদ মন্দির বানিয়ে মহান সৃষ্টার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, শান্তি খোঁজে। এই স্মৃতি সৌধ গুলোর কোন কোনটি কালের সীমানা অতিক্রম করে কালজয়ী ইতিহাস হয়। ছোট সুন্দর গ্রামের এই অতি সুন্দর ছোট মসজিদকে জড়িয়ে আছে তেমনই একটি ইতিহাস যা শুধুই অনুভবের বর্ণনার নয়। লেখক জেনেছেন এ ছোট্ট সুন্দর মসজিদের জন্যই গ্রামটির নাম হয়েছে ছোট সুন্দর। ছোট সুন্দর গ্রাম তার শ্যামলীমা নিয়ে ডাকাতিয়ার কোল ভেসে আজোও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মসজিদটি হারিয়ে ফেলেছে তার সৌন্দর্য একদিন হয়তো এ স্থাপনাটি অযত্নে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। তখন মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বের কবরে শোয়া নির্মাতার প্রিয়জন জানতেও পারবে না তাদের স্মৃতিতে নির্মিত মসজিদটি হারিয়ে গেছে। ইতিহাস বিমুখ ছোট সুন্দর গ্রামের মানুষেরা যদি একটু যত্নবান হয় তাহলে হয়তো আরো কয়েক শতাব্দী মসজিদটি টিকে থাকবে ছোট সুন্দর গ্রাম নামের স্বার্থকতা নিয়ে।

৪টি পরগনার মধ্যে মেহার পরগনাটি বহু প্রাচীন দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে মেহার নামক রাজ্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীপুরকে রাজধানী করে মেহার রাজ্য গড়ে ওঠেছিলো। ত্রয়োদশ শতাব্দীর উষালগ্নে এখানে হিন্দু রাজারা বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অধীনস্থ মিত্র রাজা হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন। শেরশাহ যখন দিল্লীর সম্রাট তখন বাংলাদেশ প্রায় স্বাধীন ছিলো। খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে সুবে বাংলায় শেরশাহ পরগনা নামে প্রশাসনিক একক স্থাপন করেন। মোগল সম্রাট আকবরের শাসন আমলে বাংলাদেশের তথা ভারত বর্ষে খাজনা আদায়কে সুসংগঠিত করার জন্যে মৌজা ও পরগনা নামক প্রশাসনিক একক গুলো খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠে। সম্রাট আকবরের সময়ে খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে ফসলী সালের প্রবর্তন হয়। বর্তমান বাংলা সালের প্রবর্তন বাদশাহ আকবরের সময়ের।

১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে মেহার নামক রাজ্যটি ৩৩৪টি মৌজা নিয়ে মেহার পরগনায় রূপান্তরিত হয়। জানা যায় সাহাপুর গ্রামে বর্তমানে বসবাসরত জমিদার পরিবারটি মেহার রাজদের অধ্বস্তন পুরুষ। সাহাপুর চৌধুরী বাড়িতে পঞ্চদশ শতকে নির্মিত দুর্গা মন্দির এখনো জ্বরাজীর্ণ অবস্থায় বর্তমান। বাড়ির বাহির ও অন্তর পথের ফটক দ্বার সম্বলিত দেয়াল বাড়িটির প্রাচীনত্বের কথা ঘোষণা করে চলেছে। মনে করা হয় পঞ্চদশ শতকে রাজ, বাড়ির প্রবেশ দ্বার হিসেবে এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিলো। দুর্গা মন্দির, লক্ষ্মী মন্দির, অতিথি শালা ও বিরাটাকার দীঘি দেখে মনে হয় এটি বেশ প্রতাপশালী রাজার বাড়ি ছিলো।

মেহার রাজ্য পরগণায় রূপান্তরীত হওয়ার সময় দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট আকবর আসীন ছিলেন। মেহার কালী বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা সদানন্দ দাস পশ্চিমা বাংলার বর্ধমান জেলার (রাঢ় অঞ্চল) অধিবাসী ছিলেন। তিনি নৌকা যোগে চন্দ্রনাথধাম অর্থাৎ সীতাকুন্ডে, তীর্থে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে নদী তীরবর্তী একটি সুন্দর গ্রাম দেখতে পান গ্রামটির শান্ত স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক রূপ তাকে মুগ্ধ করে। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেহারে আসেন, তার বর্ণনা থেকে জানা যায় সদানন্দ ঠাকুর যখন মেহার আসেন তার পূর্ব থেকেই এখানে লোকালয় ছিলো। ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে ইখতার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী গৌড় দখল করলে বাংলায়

মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এর এক শতাব্দী পরে ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে হযরত শাহ জালাল ইয়ামিনী গৌরগবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট তথা আসাম তথা কামরূপে মসুলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা, বিহার, উড়িশ্যা সহ সমগ্র আসাম মুসলিম শাসনাধীনে আসে। সে সময় বাংলার সুলতান ছিলেন শামসউদ্দিন ফিরোজশাহ্ ও তার পুত্রগণ।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ্ বাংলা শাসন করেছেন (১৩৯৩-১৪১১) প্রায় আঠার বছর এই সময়কাল অর্থাৎ আঠার বছর চাঁদপুর অঞ্চলের জন্যে স্বর্ণযুগ ছিলো। এ সময়ে রাস্তি শাহের মেহারে আগমন ঘটে থাকলে সদানন্দ ঠাকুরের মেহার কালী বাড়ি প্রতিষ্ঠা সমসাময়িক সময়ে হয়েছে। কালির সাধক ও সিদ্ধি লাভ কারী সদানন্দ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। সর্বানন্দ ঠাকুর ৩৮ বছর বয়সে সিদ্ধি লাভ করেন। অর্থাৎ ১৪২৬ সালে যখন বাংলার শাসক ছিলেন সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ (১৪১৮-১৪৩৩) সুতরাং সর্বানন্দ ঠাকুর রাস্তি শাহের আগমনের বহু পরে সিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তী সোয়া তিনশত বছর বাংলাদেশে মুসলিম শাসন অপ্রতিহত গতিতে চলে। মেহার কালী বাড়ির প্রতিষ্ঠা হজরত রাস্তি সাহেব মেহার অঞ্চলে আগমনের প্রায় শিকি বছর পরের ঘটনা। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার শাসনকাল পর্যন্ত বাংলা তথ্য আমাদের চাঁদপুর অঞ্চলে মুসলিম শাসন বর্তমান ছিলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরবিচ্ছিন্ন শাসনের পর বাংলার শেস মুসলিম শাষক নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লাহ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হন , মুর্শিদাবাদের পলাশী আম্রকাননে মুসলিম শাসকের যবনিকা পাত হয়। কালের প্রবাহে সেই মুর্শিদাবাদে ঘটে গেছে অনেক বদল, কিন্তু রয়ে গেছে ২৩ শে জুনের কলংকজনক পরাজয়ের ক্ষতচিহ্ন । সিরাজের পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে বাংলা, বাঙ্গালীর ললাটে ১৯৯০ বছরের দাসত্বের মেহের লেগে যায়। লেখক এই ১৯৯০ বছরের কোনে স্থাপনাকে বাংলার ঐতিহ্য ভুক্ত করতে নারাজ। মুর্শিদাবাদ একটি স্বাধীন দেশের রাজধানীর গৌরব হারায়। বাংলায় মুসলিম শাসকরা তিনটি স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ মুসলিম শাসকদের সর্বশেষ রাজধানী। ইংরেজরা কলিকাতা নগরীর পত্তন করে ও একে বাংলা এবং পরবর্তীতে সমগ্র ভারতবর্ষের রজধানীতে রূপান্তর করে। কোলকাতার সাথে বাংলা বাঙ্গালীর কোন গৌরব গাঁথা জড়িত নয়। ইংরেজ শাসকরা তিনটি গ্রাম ক্রয় করে ভাগিরথী নদীর তীরে এই শহরটি নির্মাণ করেন।

মুর্শিদাবাদকে আজও বলা হয় সিরাজের মুর্শিদাবাদ। এখানেই চিরনিন্দ্রায় শুয়ে আছেন সিরাজউদ্দৌলা। শুয়ে আছেন মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ। আবার বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফর আলী খাঁর শেষ ঠিকানাও এই মুর্শিদাবাদ। প্রতিবছর এখানে পর্যটকরা আসেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলার কবর জিয়ারত করেন, দেখতে আসেন সিরাজের কীর্তি। মুর্শিদ কুলি খাঁর তৈরি ঐতিহাসিক কাটরা মসজিদ, হাজার দুয়ারী প্যালেস মিউজিয়াম, ইমামবাড়া, তোপাখানা, খোশবাগ, মীরজাফরের প্রাসাদ, মোহনলালের ভিটা, জগৎ শেঠের বাড়ী, উমি চাঁদের মন্দিরসহ নানা ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান। প্রতিটি স্থানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নবাবদের কীর্তি। ১৯৭১ সনে এক মহান রক্ষক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের ফসল হিসেবে স্বাধীন বাংলার রাজধানী হিসেবে মর্যাদা ফিরে পায় ঢাকা। মুর্শিবাদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা শহর হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

মুর্শিদাবাদের নামকরণ মুর্শিদ কুলি খাঁর নামে তার আসল নাম ছিল করতলব খাঁ ১৭০০ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। দিল্লির সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তিনি ১৭০২ সালে 'দেওয়ানি' বিভাগ মকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তরিত করেন। যদিও ঢাকা থেকে যায় সুবাদারের প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবে। ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। ১৭০৩ সালে করতলব খানকে সম্রাট মুর্শিদকুলি খান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং মকসুদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ রাখার প্রস্তাব

অনুমোদন করেন। মুর্শিদকুলি খান বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। বাংলার রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদের স্থায়ীর খুবই কম ১৭০৩ থেকে ১৭৫৭ অর্থাৎ মাত্র অর্ধশতাব্দী ।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তার জামাতা উড়িষ্যার তৎকালীন নায়েব সুবাদার সুজাউদ্দিন মোঃ খাঁ বা সুজাউদ্দৌলাকে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার করা হয়। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার মসনদে বসেন। সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর পর বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা হন আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬)। আলীবর্দী খাঁ ছিলেন নবাব সিরাজের নানা। নবাব আলীবর্দী খাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হন তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। আলীবর্দী খাঁর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। ছিল তিন কন্যা, মেহেরুন্নেছা, মোমিনা ও আমিনা। সিরাজ ছিলেন আলীবর্দী খার ছোট কন্যা আমিনার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সিরাজের বাবার নাম ছিল জৈনুদ্দিন মোহাম্মদ। সিরাজের আসল নাম ছিল মির্জার মুহাম্মদ। জন্ম গ্রহণ করেন ১৭৩৩ সালে। অলীবর্দী খানঁের বড় ভাই হাজি আহমেদের তিন পুত্র-যথাক্রমে নওয়াজিশ মুহম্মদ, সায়াদ আহম্মদ ও জয়নুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আলীবর্দী খাঁন এর তিন কন্যার বড় কন্যা মেহেরুন্নছা যিনি পরিচিত ছিলেন ঘসেটি বেগম নামে তার স্বামী ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা নবাব নওয়াজিশ আহম্মদ। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ফলে ঘসেটি বেগম সিরাজের ছোট ভাই একরামউদ্দৌলাকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। এই নওয়াজিশ মহম্মদ মতিঝিল প্রাসাদ তৈরি করেন। যেখানে থাকতেন ঘসেটি বেগম। আলীবর্দী খাঁর দ্বিতীয় কন্যার পুত্র সন্তান ছিল নবাব সওকত জঙ্গ। আরীবর্দীখান বাঙ্গালী ছিলেন না, তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। নবাব পরিবারের ভাষাও বাংলা ছিলোনা। উর্দ্দুভাষী এই পরিবারটির সম্পূর্ণ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে ২৪ বছর বয়স্ক তরণ-সিরাজ রাজ সিংহাসন হারান এবং নিহত হন।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা নবাবের মসনদে বসেন। সম্পূর্ণ নাম নবাব মনসুরুল মুলক সিরাজউদ্দৌলা শাহ কুলি খাঁ মির্জা মহম্মদ হায়বত জং বাহাদুর।

বয়সে তরুন ও স্পষ্ট ভাষী হওয়ার কারনে, দুর্নীতিপরায়ন আত্মীয় স্বজন, তার সভাসদ বৃন্দ এবং কূচক্রীরা অচিরেই তার বিরোধী হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় ধীবর কুলুদ্ভুত ইংরেজ শক্তি দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে জাতি হিসেবে বাঙ্গালীদের সাথে ইংরেজ শক্তির যুদ্ধ হয়নি, একটি ব্রিটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানী ও তাদের বঙ্গদেশৌয় দোসরদের সাথে যুদ্ধ নামক প্রহসন হয়েছে। সিরাজের আত্মীয় স্বজন ও সভাসদগণ।

বেনিয়া ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে সিরাজকে সিংহাসনচুত্য ও রাজ্য হারা করার জন্যে তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন এক যুদ্ধ নামের প্রহসনের মধ্য দিয়ে সিরাজ পরাস্ত হন। মীরজাফর ও রায়দুর্লভের চক্রান্ত সিরাজকে শুধু রাজ্যহারা নয় শোচনীয় পরিনতির দিকে ঠেলে দেয়। সম্মান, রাজ্য, জীবন তিনটাই হারান বাংলার শেষ তরুন নবাব। পলাশীর যুদ্ধ শেষে বেনিয়া ইংরেজ ও তাদের হিন্দু বন্ধুরা যুদ্ধ জয়ের উপকারভোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠির জীবনে নেমে আসে অত্যাচার অবিচার এর অমানিশা। যারা ছয়টি শতাব্দী ধরে রাজ্য শাসন করেছিলো তারা মুহূর্তেই ভিক্ষুকের জাতিতে পরিনত হয়ে যায়। রাজার জাত প্রজার জাতে রূপান্তরিত হয়।

পলাশী ষড়ন্ত্রের কয়েকজন কুশলীব কিভাবে মরেছিলেন তার বিরবণ ঃ

মীরন ঃ বিনামেঘে বজ্রপাতে মৃত্যু অথবা ক্লাইভের চক্রান্তে করুন মৃত্যু।
মুহাম্মদী বেগ ঃ মাথায় গড়বড় অবস্থায় বিনা কারণে কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাপের প্রায়শ্চিত স্বরূপ অপঘাতে মৃত্যু।
মীর জাফর ঃ দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে মৃত্যু। মৃত্যুর আগে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মহারাজা নন্দকুমার দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত আনিয়ে মীর জাফরের মুখে প্রদান করেছিলেন এবং তা-ই ছিল 'নবাব' মীর জাফরের শেষ জলপান। সম্পূর্ণ বিধর্মীয় পরিবেশে তার মৃত্যু হয়েছিলো। মুখে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত নিয়ে।

মহারাজা নন্দকুমার ঃ তহবিল তসরুফ ও অন্যান্য অভিযোগের বিচারে ইংরেজরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে তাকে হত্যা করে। ১৭৭৫ সালের ৫ই আগস্ট ইংরেজ শাসকরা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে তাবেদার নন্দকুমারকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মারে। মহরাজ নন্দকুমারের ফাঁসীতে বাংলার আশন্নিত হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম হোঁচট খায়।
জগৎশেঠ মহাত্যপচাঁদ এবং তাঁরই পিতৃব্য-পুত্র মহা রাজা স্বরূপচাঁদ ঃ নবাব মীর কাশেমের আদেশে নব নব বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ মুঙ্গের দুর্গ থেকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপের ফলে ডুবন্ত অবস্থায় মৃত্যু।

ইয়ার লতিফ খান ঃ অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট অথবা গোপনে ইংরেজরা তাকে হত্যা করে তার লাশ পাওয়া যায়নি।
রায় দুলর্ভ ঃ ইংরেজ কারাগারে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু, মৃত্যুর পুর্বে চরম নির্যাতনের শিকার ।
দানিশ শাহ্ বা দানা শাহ্ ঃ বিষাক্ত সর্প দংশনে মৃত্যু। সর্পদংশনে তার সমস্ত শরীর কৃষ্ণবন ধার করে ছিলো।
রাজা রাজবল্লভ ঃ রাজা রাজবল্লভের কীর্তিনাশ করেই পদ্মা হয় কীর্তিনাশা।
উমিচাঁদ ঃ ষড়যন্ত্র বাবদ অর্থ প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রতারিত হয়ে স্মৃতিভ্রংশ উন্মাদ অবস্থায় পথে পথে ভ্রমণ ও করুন মৃত্যু। মৃত দেহের সৎকার হয়নি।

রবার্ট ক্লাইভ ঃ ইংরেজদের 'প্লাসি হিরো' বিলেতে ধন-সম্মানে আশাতিরিক্তভাবে ভূষিত হয়েও বিনাকরণে বাথরুমে ঢুকে নিজের গলায় নিজের হাতেই ক্ষুর চালিয়ে আত্ম হত্যা করেন।
ওয়াট্স্ ঃ কোম্পানীর কাছ থেকে বরাখাস্ত হয়ে মনের দুঃখে ও অনুশোচনায় বিলেতেই করুন মৃত্যু।
স্ক্রাফটন ঃ বাংলায় অত্যাচার অবিচার যা করবার করে বিলেতে যাওয়ার পথে জাহাজডুবিতে করুণ মৃত্যু।

ওয়াটসন ঃ ক্রমাগত ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে কোন ওষুধেই ফল না পেয়ে কলকাতাতেই করুণ মৃত্যু। বিলেতে ফিরে যাওয়া আর হয়নি। ব্যক্তি চরিত্র ওয়াটসনের এতই খারাপ ছিলো যা বর্ণনা করার ভাষা কোন অভিধানেই নেই। নারী লিপ্সু ওয়াটসন যৌনরোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

মীর কাশেম ঃ 'নবাব' মীর জাফরের ভাই রাজমহলের ফৌজদার মীর দায়ুদের নির্দেশে মীর কাশেম নবাব সিরাজকে দানা শা'র আস্তানা থেকে বেঁধে এনেছিলেন মুর্শিদাবাদে। তারপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নবাব হয়ে প্রকৃত নবাব হওয়ার চেষ্টা, দেশ থেকে বিদেশী প্রভাব বিদুরিত করার প্রাণপণ প্রয়াস এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় নানান স্থানে ঘুরে বেড়ানো। অবশেষে অজ্ঞাতনামা হয়ে দিল্লীর রাজ পথে করুন মৃত্যুবরণ। মৃতের শিয়রে পড়ে থাকা একটা পোটলায় পাওয়া যায় 'নবাব মীর কাশেম হিসাবে' ব্যবহৃত চাপকান। তার থেকেই জানা যায়, মৃত ব্যাক্তি বাংলার ভূতপুর্ব নবাব মীর কাশেম আলী খান! এই একজন মানুষই নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। পুরানো পাপ তার পিছু ছাড়েনি। মীর কাশেম আলী খানের করুন মৃত্যু অনেকের মনে তার প্রতি বিদ্রুপভাব কমিয়ে দিয়েছিল।

নবাব সিরাজের বাসস্থান হীরাঝিল প্রাসাদের ধনাগার থেকে ইংরেজ ও তাদের সহযোগীরা প্রাথমিকভাবে যা লুণ্ঠন করে, তার তালিকা ঃ পরবর্তী একশত নব্বই বছরের লুণ্ঠনের হিসাব নিকাশ করা প্রায় অসম্ভব। মীর জাফর আলী খান, রাজা রাজ বল্লভ , লাইভ স্বয়ং এই লুণ্ঠনে নেতৃত্ব দেন।

এক কোটি ৭৬ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, ২ সিন্দুক স্বর্ণখন্ড, ৪ বাক্স হীরা-জহরত, ২ বাক্স চুনী-পান্না। তাছাড়া গোপনে লুকানো আট কোটি টাকা ইংরেজরা, মীর জাফর-পত্নী মণি বেগম রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ নামক ক্লাইভের দুই অনুগত দাস আত্মসাৎ করে। এই কর্মচারী ও বিশ্বাসঘাতকরাই পরবর্তীতে বাংলার জমিদার শ্রেনীতে রূপান্তিরিত হয়েছিলো। ফরিদগঞ্জ উপজেলার লোহাগড় গ্রামের অত্যাচারী জমিদাররা মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় রাজা কৃষ্ণ বল্লব কর্তৃক ধন-সম্পদ স্থানান্তর কালে নবাবের লুণ্ঠিত অথের কিছু অংশ নিয়ে ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। জমিদারী কিনে গ্রামটির নাম দেয় লোহাগড়। কথিত আছে দু'জন ইংরেজ রাজ কর্মচারী সহ তারা লোহগড়ে এসেছিলেন।

রামচাঁদ ছিলেন ১০ টাকা মাস মাহিনার কর্মচারী। কোম্পানী-চাকরির ১০ বছর পর মৃত্যুকালে রেখে যায় ৭২ লক্ষ টাকা, ৮০টি স্বর্ণ কলস, ৩০০-এর উপরে রৌপ্য কলস। আরো অনেক স্থাবর অস্থাবর সম্পদ। এই রামচাঁদের অধস্তন প্রজন্ম বাংলার ইতিহাসে নিজেদের পরিচয় দেয় ঐতিহ্যবাহী জমিদার হিসেবে। কালের বিবর্তনে পাপের অর্থে ক্রয় করা এই মেকি ঐতিহ্য আজ ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে।

নবকৃষ্ণ ৩০ টাকার মাস মাহিনার কর্মচারী কোম্পানী-চাকরিতে বহাল থাকাকালে মাতৃ-শ্রাদ্ধেই খরচ করে ৯ লক্ষ টাকা। মৃত্যুকালে রেখে যায় বিরাট জমিদারী। আর এই জমিদারী ক্রয় করা হয়েছিলো তার লুণ্ঠিত অর্থদ্বারা। পাপের কামাই জমিদারীকে পরবর্তী পর্যায়ে আখ্যায়িত করা হয় ঐতিহ্যবাহী হিসেবে। নবকৃষ্ণের অনেক কীর্তি পদ্মা নদী ধ্বংশ করে দিয়ে পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে।

পলাশী-যুদ্ধে (!) অংশগ্রহণের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ বিভিন্ন জনের প্রাপ্তি ঃ

বৃটিশ স্থল ও নৌ-সেনারা পায় ঃ ৪ লক্ষ পাউ, সিলেক্ট্ কমিটির ৬ জন সদস্য পায় ঃ ৯ লক্ষ পাউ কাউন্সিল মেম্বাররা পায় (কোম্পানীর) ঃ ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পাউ, এবং রবার্ট ক্লাইভ নিজে পায় ঃ ২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউ এবং ২৪ পরগনার জমিদারী আর 'সাবাত জঙ্গ' উপাধি। এছাড়া সাধারণ ইংরেজরা কি পরিমাণ আত্মসাৎ করেছিল তা বলা দুঃসাধ্য। তবে একটি কথা সঠিক আমাদের এই বাংলায় যারা জমিদার শ্রেণী বলে চিহ্নিত তাদের প্রায় সব ছিলো ইংরেজদের তাবেদার পলাশি যুদ্ধের উপকার ভোগী শ্রেণীর বংশধর। বিশ্বাস ঘাতকদের লুণ্ঠিত অর্থেই কেনা হয়েছিলো জমিদারী। সাধারণ লুটেয়ারা পেয়ে যায় জমিদারী আর ইংরেজরা পেয়ে যায় স্থায়ী তাবেদার শ্রেণী।

"পলাশীর যুদ্ধাবসানে সেনাপতি ক্লাইভ, গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্র থেকে উদ্ধৃতি ২৫ এ জুন কলিকাতার ইংরাজমন্ডলী এই দেবদুল্লাভ বিজয়বার্তা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কলিকাতার ইংরাজ-দরবার কালক্ষয় না করিয়া, এক ত্বরিৎগতি জাহাজ সাজাইয়া মহাসমারোহে ম্যানিংহাম সাহেবকে তাহতে উঠাইয়া দিয়া বিলাতে বিজয়বার্তা প্রেরণ করিলেন। এদিকে সেনাপতি ক্লাইবের অক্ষুণ্ন অধ্যাবসায়ে মুর্শিদাবাদের নবাব-দত্ত ধনরত্ন সাতশত সিন্দুকে বোঝাই হইয়া, একশত সুসজ্জিত তরণী-সংযোগে বৃটিশ বিজয়-বৈজয়ন্তী সুবিস্তৃত করিয়া, বৃটিশের রণবাদ্যনিনাদে ভাগীরথীর উভয় তীর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নবদ্বীপে উপনীত হইল,তথা হইতে ইংরাজবন্ধু রাজা রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভুপবাহাদুরের সেনাদল পরিচালিত হইয়া, যথাকালে তাহা কলিকাতার ইংরাজ বন্দরে নিরাপদে তীরসংলগ্ন হইল।'' (উদ্ধৃতি-শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, মীর কসিম, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, চতুর্থ সংস্করণ,পৃ.১৮-১৯) লুণ্ঠনের সেই ছিলো সবে শুরু ।

তার পর দুই শতাব্দির নিরবিছিন্ন ও নিদারুণ শোষণের কবলে পড়ে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হলো। সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ হলো বাংলার মুসলিম বংশদভূত অংশ। রাতারাতি রাজার জাত মুসলিম সম্প্রদায় প্রজাতে পরিণত হলো, তাদের কর্মচারী, চাকর-বাকর অনুগ্রহ গ্রাহী প্রজা হিন্দু সেবকরা জমিদারে পরিণত হলো পলাশির যুদ্ধে জয়ী ইংরেজ শক্তির পদলেহন করে মোসাহেবের দল রাতারাতি জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হলো। ছয়শত বছরের জমে থাকা ক্ষোভ হিন্দুদের মধ্যে প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হলো। বাংলায় ছয়শত বছরের মুসলিম শাসনের অবসান হলো বটে, হিন্দু সম্প্রদায় যেই গোলাম সেই গোলামই রয়ে গেল। ইংরেজদের পদলেহন করে ওরা তাবেদারে পরিণত হলো। "কোম্পানীর কর্মচারীরা- তাহাদের প্রভু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য নহে, নিজেদের জন্য-প্রায় সমগ্র আভ্যন্তরিন বাণিজ্যের একচেটিয়া

অধিকার আদায় করিয়া লইলো। তাহরা দেশীয় লোকদের অত্যন্তঅল্প দামে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে, আর অত্যধিক চড়া দরে বৃটিশ পণ্য ক্রয় করিতে বাধ্য করিত।

কোম্পানীর কর্মচারীরা তাহাদের আশ্রয়ে একদল দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করিত " মুসলিম জন গোষ্ঠী এই প্রকারের শোষণ ও উৎপীড়ন কোনদিন দেখে নাই। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, কোম্পানী কর্তৃক সুবে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণের পর আদায়কৃত রাজস্বের অনেকাংশই চলে যেত ইংল্যান্ডে। এই সময়ে রাজস্ব ও বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়। ইংরেজ শাসকেরা তাদের পক্ষ হয়ে জমিদারদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য 'নাজিম' নামক এক পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করে। ১৭৭২ সালে(ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেই) রাজস্ব-কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট কোম্পানীর 'বোর্ড অব ডাইরেকটরস' -এর নিকট এক পত্রে লিখেন; (কার্ল মার্কস, রেজিনাল্ড রেনল্ডস প্রমুখ এই ব্যবস্থাকে প্রকাশ্যে দস্যুতা বলে অভিহিত করেছেন।)

''এই দেশীয় কর্মচারীরা যে অঞ্চলেই উপস্থিত হইত সেই অঞ্চলই ছারখার করিয়া দিত, সেইখানেই সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিত এদের বেশির ভাগই হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যেকটি কর্মচারী ছিল তাহার প্রভুর (উচ্চপদস্থ কর্মচারীর) শক্তিতে শক্তিমান বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ স্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহা সত্য যে, বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যস্ত ; তাই প্রতিরোধের বদলে করুনা ভিক্ষা তাদের মন্বন্তরের দিকে ঠেলে দিল।'' ১৭৭৬ সনের মন্বন্তর সারা দেশের মতোই চাঁদপুর অঞ্চলে কালো থাবা বিস্তার করেছিলো। চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার বালিথুবা ইউনিয়নের লোহাগড়ে যে তিনটি মঠ ও ধ্বংশ প্রাপ্ত জমিদার বাড়ি আছে, সে জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নবাবের ভান্ডার লুণ্ঠনকারীদের একজন ইংরেজ বন্ধু কৃষ্ণ বল্লভের কর্মচারী। মুর্শিদাবাদ থেকে নবাবের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে সেই অর্থে জমিদারী ক্রয় করে লোহাগড় নামক গ্রামের পত্তন করে।

লোহাগড় জমিদারদের কীর্তি আমাদের ঐতিহ্য নয় আমাদের কলংক এই রক্তচোষা দুর্বিনাত জমিদার ছিলো খুবই ভয়ানক। ইংরেজী ১৭৬৯-৭০ সালে, বাংলা ১১৭৬ সনের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলার এক -তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মরেছিল, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস চাপ প্রয়োগ করে তখনও নির্ধারিত রাজস্বেরও বেশি রাজস্ব আদায় করেছিলেন, বাংলার বুকে ধুকে-মরা মানুষের কাছ থেকে। তদুপরি, এই দুর্ভিক্ষটা ছিল মুনাফা লোভী ইংরেজ বণিকরাজ ও তাদের এদেশীয় কর্মচারীদের সৃষ্ট। টাকার বন্যায় লোহাগড় জমিদার বাড়ি সৃষ্টি হলো অথচ ১৭৭০ সালের অর্থাৎ ১১৭৬ সনের মহামন্বন্তরে মরে গেল এদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ। এটাই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে অভিহিত। এই মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ঐটঝইঅঘউ এই মহামন্বন্তরের দায়িত্ব অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈব-দুর্বিপাকের উপর চাপিয়ে দেননি। ১৭৬৮ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন ঃ

" তাহাদের (কোম্পানীর কর্মচারীদের) মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। তাহারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মূল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে। চাষীরা তাহাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদ্যামে মজুদ হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব । দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা ইংরেজ বণিকগণের একচেটিয়া দখলে চলিয়া গেল। .....খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চিরদুঃখময় জীবনের উপর পতিত হইল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র। .....চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খৃস্টাব্দ; সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেইখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান-চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই

জঘন্যতম ব্যবসায়ে মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে , মুর্শিদাবাদের .....একজন কপর্দকশূন্য ইংরেজ ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুর্ভিক্ষ্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ হাজার পাউন্ড (তখনকার টাকার মুল্যমানে দেড় লক্ষাধিক টাকা) ইংল্যান্ডে পাঠাইয়াছিলেন।"

সারা বাংলায় কংকালসার মানুষ আর লাশের সারি। অসংখ্য নারীর সম্ভ্রম ধুলায় লুঠাইলো। নব জমিদার শ্রেণী দিনে পরদিন মোটা হইতে শুরু করিলো। লুণ্ঠনের জন্যে সামান্যতম অনুশোচনা ক্লাইভে ছিলোনা। নারীর উদর ছিন্ন করে গর্ভময় সন্তান কন্যা কিংবা পুত্র তা দেখার বিকৃত আনন্দে বিভোর হয়ে রইলো বাংলার নতুন জমিদার শ্রেণী লোহাগড় জমিদার বাড়ি তেমনি একটি।

চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় " তাহাদের সন্তান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের কে কিনিবে, কে খাওয়াইবে ? বহু অঞ্চলে জীবিত মানুষ মৃতের মাংস খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নদীতার মৃতদেহে ও মুমূর্ষুদেহে ছাইয়া গিয়াছিল। মরিবার পুর্বেই মুমূর্ষুদের দেহের মাংস শিয়াল-কুকুরে খাইয়া ফেলিত।" বাংলার এই দুঃখ দুর্দশার কথা সাগর, মহাসাগর অতিক্রম করে স্রেটবৃটেনে গিয়ে মানবতার দ্বাবে করাঘাত করলো।

উত্তরকালে এই -সব টাকাকড়ি নেওয়ার বিষয় তদন্ত করবার জন্যে পার্লমেন্ট এক কমিটি বসিয়েছিলেন। কমিটির কাছে অভিযোগের উত্তর দিতে -দিতে গরম হয়ে উঠে ক্লাইভ টেবিল থাপড়িয়ে বলে উঠলেন, সভাপতি মশায় এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দ, আমি আমার তখনকার সংযমের কথা ভেবে এখন একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যখন নবাবের সমস্ত ধনদৌলত আমার পায়ের নিচে, যখন মীর জাফর থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের সমস্ত আমীর - ওমরা ও আমার পায়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ,তখন আমি সিরাজউদ্দৌলার তোষাখানা থেকে নিজের জন্যে মাত্র একুশ লাখ টাকা নিয়েছিলুম।আমি কি করে যে তখন নিজের লোভ সামলেছিলুম ,তা শুধু ভাবতে গিয়েই এখন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

(তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত ' পলাশির যুদ্ধ' থেকে ,পৃ.১৭৭) বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে ইংরেজ শাসিত একশত নব্বই বছর সত্যিকার অর্থেই বিড়ম্বনার ইতিহাস।

"ইতিহাসে এরূপ অকস্মাৎ ভাগ্যবিবর্তনের বিবরণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরাও বলিয়া থাকেন- এই উপলক্ষে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অল্প যুদ্ধেই সেরূপ আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভূত হইয়াছে। " Early recods of British India Page 26 উদ্ধৃত - প্রাগুক্ত,পৃ.১৯)।

এরপর মীরজাফরী নবাবীকালে আরম্ভ হয় ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত উৎকোচ গ্রহণ, ব্যবসায়ের নামে কোম্পানীর অবাধ লুণ্ঠন ও ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায় এবং তা করতে গিয়ে আদায়কারীদের আরও লুণ্ঠন। ১৭৬৬ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বৃটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপারে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করে। অনুসন্ধানের পর কমিটি যে তালিকা প্রস্তুত করে তাতে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার থেকে মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ তখনকার টাকার মুল্যমানে ৯ কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন।

ইউরোপীয় শক্তি সমূহের মধ্যে পর্তুগীজরা একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বাহিরে পা রেখেছিলন। এয়োদশ শতাব্দীর শেষলগ্নে ভারত বর্ষের উপকূলে নৌজাহাজ ভিড়িয়ে ছিলেন ভাস্কো দ্যা গামা। ইংরেজরা এদেশে এসেছেন অনেক পরে কিন্তু কুট কৌশলে সকলকে হারিয়ে সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে বাংলা্য বিহার উড়িষ্যা জয়করে, এতদঅঞ্চলের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে পরবর্তী দু'শতকে সারা বিশ্বে তাদের অগ্রযাত্রাকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়েছে। সুপ্রিয় পাঠক এবার একটি রাজআসনের কাহিনীতে যাবো, যার সাথে সে দিন জড়িয়েছিলো বাংলার ভাগ্য।'তখ্ত্ মোবরক' একটি সিংহাসন বা মসনদ। সম্রাট শাহ্জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্জাদা শুজা যখন বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন, তখন এই সিংহাসনটি তিনি তৈরি করান। এটি খুব বড় নয়। গঠনগৌরবহীন ঈষদুন্নত চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সুসজ্জিতস্তর ফলকের পাশে খোদিত আছে ঃ "তৈয়ার শোদ তখ্ত্ মোবারক বতারিখ্ বিস্তওহফ্তম্ সহর সাবনুলমণ আজ্জাম ১০৫২ বএতমাম্ কমতারিণে বান্দাহা খাজা বোখারী কি মোকামে মুঙ্গের সিন্ সুবা বেহার।"

''এই পরম কল্যাণময় রাজসিংহাসন সুবা বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের শহরে ১০৫২ সালের ২৭ –এ শাবান তারিখে দাস্যানুদাস খাজা নফর বোখারী কর্তৃক নির্মিত।''

শাহ্জাদা সুবোদার শুজা এই সিংহাসনে উপবেশন করে রাজকার্য চালাতেন। তখন থেকে একে বলা হতো 'তখ্ত্ মোবারক' । প্রথমে রাজমহল, তারপর ঢাকা, অতঃপর মুর্শিদাবাদে এই সিংহাসন নীত হয়। এই একটি সিংহাসন বাংলার তিনটি রাজধানীর শোভা বৃদ্ধি করেছিলো। কারণ সুবা বাংলার রাজধানী শাহ্জাদা শুজা থেকে মুর্শিদ কুলী খাঁন পর্যন্ত প্রথমে রাজমহল, পরে ঢাকা, তারও পরে মুর্শিদাবাদে স্থানান্ত রিত হয়। তারপর থেকে এই বহুমূল্য রত্ন–সিংহাসন আরও সংশোধিত করে তাতে বাংলার সুবাদারগণ ও পরে নবাব–নাজিমগণ সগৌরবে উপবেশন করতেন। নবাব সিরাজ এই সিংহাসনকে হীরাঝিল প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাতে তিনি উপবেশন করেছেন মাত্র সোয়া্া এক বছর, এক বছর আড়াই মাস। নবাব সিরাজের ক্ষমতাচ্যুতির পর আর কেউ এই সিংহাসনের গৌরব রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন নাই। বাংলার ভাগ্যের সাথে তখত মোবরকের ভাগ্য অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। উপবেশনকারী শাসকে ভাগ্য বিপর্যয়ের পর সিংহাসন টিও তার মর্যাদও গুরুত্ব হারায়।

পরবতীকালে এই সিংহাসন অনাবৃত অবস্থায় বাইরে পড়ে থেকে রৌদ্রতাপ আর বৃষ্টিতে ভিজত। পরবর্তী নবাব–নাজিমগণ হয়তো মনে করতেন, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁদের 'শত্রু' নবাব সিরাজের স্মৃতি। তাই হয়তো এর প্রতি তাঁদের যত্নের অনীহা! রৌদ্রবৃষ্টি এই সিংহাসন গাত্রে কতগুলো রেখাচিহ্নর সৃষ্টি করেছিল। আগ্রার প্রাসাদে রক্ষিত বৃহদায়তন যে রাজ –সিংহাসন ,তাতেওএ জাতীয় রেখাচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। 'তখ্ত্ মোবারক' সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মুসলমানদিগের বিশ্বাস ঃ মুসলমানের অতীত গৌরব স্মরণ করে ' তখ্ত্ মোবারক' এখনও নীরবে রোদন করে; গৈরিক রেখাচিহ্ন সেই নীরব রোদনের অশ্রুলেখা।

ইংরেজ ঐতিহাসিক বেভারিজের কথায়, '' পাথরে লোহা মিশ্রিত আছে বলেই কখনো তা এত স্ফীত হয় যে রেখাচিহ্ন প্রান্ত বেয়ে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে।" এটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যাই গ্রহনীয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মুসলমানেরা, যাদের অতীতের গৌরব স্মৃতি ও শ্রুতি এই সিংহাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাদের কাছে এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অতীতও কিছু আছে। তা নিছক মনের অনুভূতি হতে পারে; কিন্তু এ–জাতীয় অনুভূতিও সত্য–জাত। তাই এই অনুভূতি ও অর্থহীন নয়, নয় মূল্যহীন। " এই মোগল–রাজ সিংহাসনের সাথে মীর জাফরের কলঙ্ক কাহিনীও চিরসংযুক্ত হয়ে রয়েছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হতে পারেন নাই। সাড়ে পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের সম্মুখে কুর্ণিশ করিতে করিতে হিন্দু –সন্তানের পক্ষে মুসলমান–শাসন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো; তাহারা কেহ

রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হয়ে, মুসলমানের দোহাই দিয়ে, শাসন ও শোষণকার্য হস্তগত করেছিলো। সিরাজদ্দৌলা তাহার মুলোচ্ছেদের চেষ্টা করায়, সকলে মিলে মীর জাফরের সহায়তায় সিরাজদ্দৌলার উচ্ছেদ সাধন করেন; সুতরাং হিন্দু কখনও মীর জাফরের কথাা ভুলতে পারবে না।

মুসলমান অনেক দিনের নবাব। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই সে নবাব দরবাারে জানু পেতে উপবেশন করতেন। যে নিতান্ত নগণ্য মুসলমান, তাহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হয়ে উঠিত। মীর জাফরের ব্যবহাার গুণেই মুসলমানের সে পূর্ব গৌরব বিনষ্ট হয়ে গিয়াছে। সুতরাং মুসলমানও মীর জাফরের কথাা বিস্মৃত হতে পারবে না। একশত নব্বই বছরের প্রতিটি শ্বাস ছিলো কষ্টের , এই কষ্টের হোতা মীর জাফর আলী খান মুসলমান তাকে ভুলবে কেমনে।

ইংরাজের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা নিস্প্রয়োজন। বিদেশে বাণিজ্য করতে এসে, যাঁহার প্রাসাদে এমন স্বর্ণসিংহাসন কুড়িয়ে পেছেন, সেই মীর জাফরের কথা ইংরাজগণ কোন্ লজ্জায় এত অল্পদিনেই বিস্মৃত হবেন।.....মীর জাফর কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরিয়াা একবার মাত্র' তখ্ত্ মোবারক' পদার্পণ করলেন, কিন্তু তাহাতে আর অধিক দিন উপবেশন করতে পারলাম না। সেই সময় হতে এই পুরাতন রাজসিংহান অযত্নে অনাদরে পড়ে রয়েছে।" (মীর কাসিম,অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, এন্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতাা, চতুর্থ সংস্করণ ,রাজশাহী ,ভাদ্র ১৩১২ সাল, পৃ.৩,৬) । সূচীপত্রের পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন ঃ " এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পর, লর্ড কার্জনের কৃপায় 'কলিকাতাা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল 'মন্দিরে' রক্ষিত হবার উদ্দেশ্য 'তখ্ত্ মোবারক' মুরশিদাবাদ হতে কলিকাতায় আনীত হইয়াছে।" এখনও সেই বিখ্যাত '' তখত মোবারক ওখানেই সংরক্ষিত আছে। বাংলা বিহার উড়িষ্যা ভেঙ্গে খান খান হয়েছে, হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভূদয় কিন্তু তখত মোবারক তার হাত গৌরব ফিরে পায়নি।

মীর জাফর আলী খান সিরাজের আত্মীয় ছিলেন। সিরাজের মাতার ফুফা্ ভবঘুরে এই ব্যক্তিকে আলীবদী খাান নিজ সেনাবাহিনীতে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মীর জাফর আলী খান নিজ যোগ্যতার বলেই প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন, আলীবর্দী খানের বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে ইংরেজ ও দেশীয় ক্ষমতা ধর ব্যাক্তিবর্গ বিশেষ করে রায়র্দুল্লভ, রাজারাজবল্লভ, উমিচাঁদ, মহাতাপ চাঁদ জগৎ শেঠ, রাজা স্বরুপ চাঁদ, ইয়ার লতিফ এই কয়জনের শলাপরামর্শে সিরাজকে রাজ্যহারা ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। পলাশীর যুদ্ধ সারা জীবনের জন্যে মীর জাফর আলী খানের কপালে বিশ্বাসঘাতকের কলংক তিলক এঁকে দেয়। বিশ্বাস ঘাতক আর মীর জাফর শব্দ দু'টো বাংলা ভাষার অভিধানে সমার্থবোধক হয়ে ওঠে। যে কোন বেঈমানকে বাংলার লোকজন মীরজাফর বলেই সম্ভোধন করে থাকে।

সিরাজ উদ্দৌলার পতনের সাথে সাথে বাংলায় মুসলিম শাসনের পতন ঘটে। জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অধিবাসীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ ভাগ্য বিড়ম্বিত পলাশী যুদ্ধে হেরে যাওয়া মুসলিম ধর্মালম্বীরা, অন্য ভাগে বিজয়ী ইংরেজ শক্তির এদেশীয় তাবেদার হিন্দু ধর্মালম্বী বাঙ্গালীরা, যারা প্রায় ছয়শত বছর মুসলিম শাসকদের গুন গ্রাহী আজ্ঞাবহ দাসানুদাস ছিলো। পলাশীযুদ্ধ এদের মাঝেদীর্ঘ প্রাচীর গড়ে তোলে। অবিশ্বাস আর প্রতিহিংসা ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যকে গিলে খেতে শুরু করে। আকবর, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ, ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ, সিরাজউদ্দৌলা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলা গড়ে তুলেছিলেন। পৌনে দুইশত বছরের ইংরেজ শাসনে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আবারো, হিন্দু মুসলিম ঐক্যের একটা আবহ তৈরী করেছে, উপযুক্ত লালনের অভাবে যুগের মহেন্দ্রক্ষণের অর্জনটিও হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায় বিগত দুই শতাব্দীর শোষণ ও বঞ্চনাকে ভুলতে পারছে না। হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষমতা হারোনোর শোকে মুখ্যমান। তাদের তাবেদারী জমিদারী প্রথাসহ সবকিছু অতিক্রম করে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের মঙ্গালের জন্যে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। চাঁদপুর জেলার মতলব (দঃ) উপজেলার নারায়নপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি পুকুরে দু'পাড়ে একটি মসজিদ ও একটি মন্দির আছে। কোন এক নাম অজনা মুসলিম অর্থশালী ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীত লক্ষ্যে প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পুর্বে স্থাপনা দু'টি নির্মাণ করে দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে এটি একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

সবকিছু অতিক্রম করে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের মঙ্গালের জন্যে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। চাঁদপুর জেলার সহস্রাব্দের অতীত খুঁজতে গিয়ে এখানে ইসলাম ও মুসলিম অনুষঙ্গ নিয়ে খানিকটা আলাপ হয়েছে। চাঁদপুর জেলার পরতে পরতে ইসলামী স্থাপনা সমুহ ও সুশাসকদের কীর্তি আস্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। হাজীগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুর গ্রামটির কথা খানিকটা আলাপ করা দরকার সেই গ্রামে মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকা মসজিদটি সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এই মহান শাসক (১৩০১-১৩২২) দুই দশকের ও বেশি সময় বাংলা শাসন করেছেন। তার সময় বাংলার সীমানা সাতগাঁও, ময়মনসিংহ, সোনরগাঁও থেকে সুদুর সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ অর্থ্যাৎ সাতগাঁও (রাঢ়) থেকে শুরু করে সমতট অঞ্চল পেরিয়ে বাংলার সীমানা কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তখন সমতট থেকে বিতাড়িত হিন্দু রাজারা কামরূপ অঞ্চলে সমবেত হয়েছিলো। ফিরোজ শাহের সেনাপতি সিকান্দর শাহ হযরত শাহজালাল ইয়ামেনীর সাহায্য সহযোগিতায়, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের প্রতিভূ গৌরগবিন্দকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সিলেট অধিকার করেন। সিলেটে মুসলিম সেনাদল শতাব্দীর বৃহত্তম বাধার সম্মুখীন হয়েছিলো। ফিরোজ শাহের সেনাপতি দু'বার পরাজয়ের পর তৃতীয় বার হজরত শাহ জালালের স্বক্রিয় সহযোগিতায় বিজয় অর্জন করে। সমগ্র কামরূপ অঞ্চলে ইসলাম তার সুশীতল ছায়া বিস্তার লাভ করে। হজরত শাহজালালের আগমন এই অঞ্চলে ন্যায় ও সাম্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হজরত শাহ জালালের সাথে যে ৩৬০জন আওলিয়া এই অঞ্চলে এসেছিলেন তাদের কয়েকজনের সমাধি চাঁদপুর অঞ্চলে রয়েছে।

ঐতিহাসিক স্টেপলটনের বর্ণনায় জানা যায়, শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ বিহার, লাখনৌতি (গৌড় লক্ষণাবতী) সাতগাঁও (রাঢ়) বঙ্গ (সমতট সোনার গাঁও) কামরুত (কামরূপ) সিলেট পর্যন্ত এলাকা শাসন করতেন। এই অঞ্চল সমুহ শাসন করার জন্যে তিনি নৌপথকেই যোগাযোগের ম্যাধ্যম হিসেব ব্যবহার করতেন। মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরী, গড়াই শঙ্খ বিধৌত অঞ্চল সমুহ নৌ যোগাযোগ নৌপথ নির্ভর ছিলো। বর্তমান চাঁদপুর জেলা অতিক্রম করেই সিলেট ও কামরূপ যেতে হতো চট্টগ্রামের সাথে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ চাঁদপুর বন্দর হয়েই স্থাপিত হয়েছিলো। চাঁদপুরের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তখন মেঘনার শাখা নদী সমুহ নৌবাণিজ্য তথা সেনা চলাচলেরও প্রধান মাধ্যম ছিলো। এই নদী সমুহ কালের বিবর্তনে ভূ-প্রাকৃতিক কারণে হারিয়ে গেছে। অনেক নদীর তলদেশে ভরাট হয়ে সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ১৩০৩ সালে হজরত শাহজালাল সিলেট জয় করেন।

১৩০১ সালে ফিরোজশাহ বাংলার মসনদে আরোহন করেন। তার নামানুসারে স্থানীয় ফৌজদার দেওয়ান ফিরোজ খান ফিরোজপুর গ্রামের পত্তন করেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অবশ্য তার বহু পুর্বেই চাঁদপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিলো। ইতিহাস পর্যালোচনাও শিলালিপি সমুহের পাঠোদ্ধার এবং পুরাকীর্তি ও প্রত্নসম্পদগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় বর্তমান চাঁদপুর জেলার

অবস্থান মুসলিম শাসন আমলে খুবই উজ্জ্বল ছিলো। ১২০৩ সালে ইখতার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী গৌড় অধিকার করেন, তার ও পূর্বে। অর্থ্যাৎ ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাশেমের স্থলপথে সিন্ধু বিজয়ের আগে নৌপথে বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সু-মাত্রা, বর্ণিও, মালয়েশিয়া ও সুদুর চীনের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে আরব বণিকরা বাংলা দেশের দ্বীপ সমূহে আসা যাওয়া শুরু করে কোথাও কোথাও বসতি স্থাপন করে। তাদের সাথে ইসলাম ও এদেশে তার সাম্য শান্তির বাণী নিয়ে প্রবেশ করে। সে সময়ে সমুদ্র নিকটবর্তী ।

নদী মাতৃক হওয়ার কারণে চাঁদপুর অঞ্চল বাংলার নৌবাণিজ্যের এক গুরুত্বপুর্ন অংশ উজ্জ্বল করে রেখেছিলো। প্রায় হাজার বছর পুর্ব থেকেই চাঁদপুর অঞ্চল বাণিজ্য নির্ভর ছিলো। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চাঁদপুরের সমগ্র এলাকাটি সমতল ভূমি, এর সৃষ্টি মেঘনা পদ্মাবাহিত পলি মাটির দ্বারা। ডাকাতিয়া ধনাগোদা ও নাম হারানো কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া মেঘনার শাখা নদীসমূহ জালের মতো ছড়িয়ে ছিলো চাঁদপুর অঞ্চল ঘিরে। অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি এ নদ-নদী গুলোর গতিপথ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে অতীতের বহু সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। হারিয়ে গেছে অনেক নগর লোকালয়। কচুয়ায় উজানী নগর, হাজীগঞ্জের ফিরোজপুর কচুয়ার আশ্রাফপুর, ফরিদগঞ্জের সাহেবগঞ্জ নদী তীরবর্তী ছিলো এ কথা প্রমাণ করার জন্যে বর্তমানে প্রাপ্য ইতিহাস গ্রন্থ সমূহ য়থেষ্ট। এ গুলো পর্যালোচনাকালে ইতিহাসের দুরাগত ধ্বনি সমূহ এখনও খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

চাঁদপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক বর্তমানে সরকারের সচিব আবু মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র জীবনে চাঁদপুর গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেছেন, চাঁদপুর জেলার জেলা প্রশাসক হিসেব দায়ত্ব নেওয়ার পর তার ইচ্ছে ছিলো, চাঁদপুরের একটি সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার। তিনি চাঁদপুরে অবস্থান কালীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবদুল হালিম, ম্যাজিস্ট্রেট ফখরুল ইসলাম আজিজী ও লেখককে নিয়ে চাঁদপুরের একটি ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কর্মকর্তাদের বদলীজনিত কারনে সে কাজ থেমে গেছে। কাজটির ধারাবাহিকতায় লেখক চাঁদপুর অঞ্চলের ইতিহাসের খোঁজে, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত বিভাগের দপ্তর, আগারগাওস্থ আর্কাইভস্ বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন বরণ্য ব্যক্তিবর্গ রচিত ইতিহাস সমূহ খুঁজেছেন।

ইতিহাসে নানা কারণে অনেক স্থানের নাম ও অবস্থান বদল হয়ে য়াওয়াতে চাঁদপুরকে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর হয়ে দাড়িয়েছে। অনেকের সাথে লেখকও অনুভব করেছেন উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমন ও মুসলিম শাসন কায়েমের ঘটনা এক যুগান্তকারী ইতিহাস রূপে আবির্ভূত। স্মরণ করা যায় যে, তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম উপ-মহাদেশে প্রথম মুসলিম অভিযানকারী। অষ্টম শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে তিনি সিন্ধুতে তার ঐতিহাসিক অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে একাদশ শতাব্দীতে দিল্লী কেন্দ্রিক মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্দ বিন বখতিয়ার খিলজী (১২০৩/১২০৪) সর্ব প্রথম বাংলাদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্দু প্রদেশ আরব শাসন কায়েম করেন। বাংলায় তৎকর্তৃক মুসলিম শাসন কায়েম হয়। ইংরেজরা শাসন কর্তৃত্ব দখলের পুর্ব পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর অসংখ্য মুসলিম শাসনকর্তা, স্বাধীন সুলতান ও নবাব আমলে বাংলা কার্যত সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তার আগে বা পরে কার্যত কিংবা নামেমাত্র হলেও বাংলার শাসনকর্তারা দিল্লীর শাসনাধীনে থেকেছন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর পরাজয়ের পর দুইশত বছর অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলার শাসন ক্ষমতা মুসলিম শাসক বর্জিত ছিলো। ১৭৫৭ সালের ১৪ আগস্ট ইংরেজদের বাংলা ত্যাগ ও ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুধয় পর্যন্ত ও বাংলা সত্যিকার অর্থে পরাধীন ছিলো। এই সময়টুকু ছাড়, বাংলার শাসন ক্ষমতায় মুসলিম শাসকরাই ছিলো।

সকল বিষয় আলোচনা ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল দেশের মতো বাংলাদেশেরও রয়েছে একটি বিবর্তনের ইতিহাস। তা যেমন বর্ণাঢ্য, তেমনি আকর্ষণীয়। প্রাচীন কালে এই ভূখন্ড ছিল পৌত্তলিক ধর্মাচারণে লালিত এবং পরিচালিত। ফলে পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের জাঁতাকালে সাধারণ মানুষ শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছিল যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী। ধর্মের নামে, দেবতার নামে এখানে পৌত্তলিক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল – যার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে শোষণ করা, অন্যকে পদানত করা।

পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মের কিছুটা উদার মানবিকতাও পূর্বতন হিন্দু ধর্মের প্রভাব বলয়ের আক্রমন থেকে রহাই পায়নি। এভাবেই সহস্র বছর অতীত থেকে বাংলার অন্ধকার ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছিল বিগত এগারো খৃস্টীয় শতক পর্যন্ত। সুফী-দরবেশ এবং মসলিম বিজেতাদের আগমন সেক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায় এবং বাংলাদেশ ভূখন্ডে ইসলামের মানবিক ও সাম্যের বাণী গণমানুষের জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করে। ইতিহাসের বাঁক বদল হয়। পৌত্তলিক আবহে আবর্তিত আদি জনগোষ্ঠীর জীবনে তা মুক্তি ও সৌভাগ্যের পরশ বুলিয়ে দেয়। তারা তৌহিদের অনুপম ধর্ম ইসলামের ছায়ায় শান্তি খুঁজে পায়। ইসলামের আলোয় আলোকিত একটি সঙ্ঘাবদ্ধ জনপদ এই ভূখন্ডে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। একথা অনস্বীকার্য, মুসলিম শাসনকর্তারা বাংলা ভূখন্ডে ইসলামের প্রচারও প্রসারে বিপুল ভূমিকা পালনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু তাদের সেই ভূমিকাও অবদানের কথা আমরা আজ বিস্মৃত প্রায়।

ইংরেজ শাসক ও এদেশীয় তাদের তাবেদাররা মুসলমানদের বর্বর জাতি হিসেবে বার বার প্রমাণ করতে চেয়েছে। অথচ মুসলমানরাই এদেশে সর্বপ্রথম আধুনিক প্রশাসন যন্ত্র কায়েম করে ছিলো। এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা বাংলায় মুসলিম শাসনের বিন্দু বিসর্গ নিয়ে আলাপ করেছি। মুসলমানরাই সর্ব প্রথম এই ভূখন্ডে সকল ধর্মে অধিকার কায়েম করে। সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসে। গণমানুষের উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন পূর্তকর্ম রাজকীয় অর্থে সম্পাদন করে।

আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এক কালে বাংলা মুলুক, সুবে বাংলা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। বাংলা অঞ্চল কখনো ছিল স্বাধীন, কখনো দিল্লীর শাসনাধীন। সকল কিছুর ওপর একথা সত্যি বাংলারগণ মানুষ কখন বিদেশীদের পরাভর স্বীকার করেনি। ইংরেজ শাসকরা এদেশে দু'শত বছর রাজত্ব করেছে সত্যি কিনউত গণ মানুষের অন্তরে স্থায়ী আসন পায়নি।

এভাবে বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে বাংলাদেশ। আর রচিত হয়েছে বাংলা শাসন ইতিহাস। লক্ষণীয়, বৃটিশরা শাসনক্ষমতা দখল করার পূর্ব পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বছর যারা বাংলাদেশ শাসন করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান। এসব মুসলিম শাসকদের অধিকাংশই এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মানবিক ধারার প্রশাসন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং বিকাশে বিভিন্নমুখী ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলার এসব শাসকদের ব্যাপারে আমাদের অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই। আজ কথায় কথায় বক্তৃতা বিবৃতিতে বলা হয় বাংলার মুসলিমরা ছিলো গরবী চাষী, জমিদার ছিলো হিন্দুরা। অথচ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো।

পৌনে দু'শত বছর মুসলিমরা বিজয়ী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলো, হৃত রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনরোদ্ধারের কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত এসময় ইংরেজের তাবেদার কতিপয় হিন্দু সুবিধাভোগী তস্কর প্রকৃতির লোক ছলে বলে কুট কৌশলে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রজা বানিয়ে রেখেছিলো। ইংরেজদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। আমাদের সেই অতীত সমৃদ্ধ ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের সম্মুখে নিয়ে আসতে হবে। বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বা যা আজ এপার ওপার দু' বাঙ্গলাই বর্তমান তার স্রষ্টা মুসলিম শাসকবৃন্দ। মুসলিম শাসকদের পূর্বে এরূপ জমাট বাধা সঙ্গাবদ্ধ বাঙালী জাতিসত্ত্বা বাংলা কখনো ছিলো না। আধুনিক বাংলাভাষা , সংস্কৃতি সঙ্গীত মুসলিম শাসকদের সৃষ্টি।

প্রবন্ধটি শেষ করার আগে আমি একটি জনপ্রিয় দেশ সঙ্গীতের বাণীর দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ''হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে/ বাংলার বুকে আছি দাড়িয়ে " গানটি আমি শুনেছিলাম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের উষালগ্নে এ হাজার বছর কোন হাজার বছর? দীর্ঘদিন তার উত্তর খুঁজেছি আমি। পরে ইতিহাসে তার উত্তর লিপিবদ্ধ দেখেছি। এই হাজার বছরই বাংলা বাঙ্গালীর । গীতিকার সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেছেন। হাজর বছর পরে নয় দুইশত বছর পরে আবার এসেছি ফিরে বাংলার বুকে আদি দাঁড়িয়ে। একথাটিই লেখ উচিৎ ছিলো। আজ বাংলা বিরোধী বলতে মুসলিমদের বোঝানে কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কথা প্রসংগে বলতে হয় বাঙালির ইতিহাসে পাল সম্রাটরাই সবচেয়ে উপযুক্ত ও সমৃদ্ধ নৃপতি। এদের রাজত্বকালীন বিশেষ করে তৃতীয় পাল সম্রাট দেবপালের রাজত্বকালে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালিরা ভারতবর্ষের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যাতায়াত করতেন। এই পালরাই বাংলা অঞ্চল থেকে উদ্ভুত শেষ বাঙালি সম্রাট ছিলেন। পালদের পর ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে উদ্ভুদ কোন বাঙালির হাতে কখোনেই বাংলা শাসনের ভার ছিল না। তবে মুসলিম শাসকরা বাঙ্গালীতে পরিণত হয়েছিলেন। পালদের পরবর্তী সেন রাজারা ছিলেন কর্নাটের মানুষ। এরা হিন্দুধর্মের বর্ণশ্রম বাংলায় চালু করে জনগোষ্ঠীকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করে ফেলেন। এরা সমুদ্রযাত্রা ধর্ম বর্হিভূত বলে বিধান দেন। ফলে বাঙালি প্রজা সাধারণ ঘরকুনো হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ আমলেও বিদ্রোহের কারণে বাঙালিকে বাংলাতেই আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ব্রিটিশবিরোধী প্রধান আন্দোলনগুলো শুরু হতো বাংলা থেকেই।

পাকিস্তান আমলেও অবস্থার হেরফের হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমত মধ্যপ্রাচ্যে, তারপর ইউরোপ, আমেরিকায় বাঙালিরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে ছুটে যান। আর তখনই মুক্ত পৃথিবীর দ্বার বাংলাদেশ ও তার অধিবাসীদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। একদা ঘর কুনো বলে কুখ্যাতি অর্জনকারী বাঙ্গালীদের নব প্রজন্ম আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে অসাময়িক জাতি বলে যারা বাঙালীদের আখ্যায়িত করে ছিলো, তারাই এখন সমগ্র পৃথিবীর দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে শান্তিরক্ষীর প্রয়োজনে বাংলাদেশী সেনা খোঁজে বেড়ান। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে শান্তি রক্ষায় আজ সহস্র বাঙ্গালী সেনা গর্বউন্নত শিরে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বর্তমানে জাতিসঙ্গা শান্তি রক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের একটি পতাকা উড্ডীন আছে। এ লাল সবুজ পতাকা দীর্ঘ সময় পর আবার জাতি হিসেবে বাঙ্গালীর গর্বের পরিচয়। এছাড়া বিশ্বের সাথে আমাদের যোগাযোগ এখানো খুব প্রবল নয়। বর্তমান সময়ে, বৈশ্বায়নের যুগে আমাদের দেশে যে হাজারখানেক এনজিও রয়েছে তারা দেশের দারিদ্র বিক্রিতে ব্যস্ত। তারা প্রমান করে ছেড়েছেন, এদেশ খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ। সেই সঙ্গে জনগণও মৌলবাদী, অরাজক। বিদেশী প্রচার মাধ্যম এটাকে পুজিঁ করতে পছন্দ করেন।

স্বাধীন সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আমাদের একটা অতীত পরিচয় আছে সেটা আজ বিস্তৃত প্রায়। অথচ এই এন.জি.ও গুলোর একটা বক্তব্য ও সঠিক নয়। দেশ ও জাতির সাময়িক দুর্বলতাকে পুঁজি করে ওরা

নিজেদের আখের আচ্ছাতে ব্যস্ত। বিগত একটি সহস্রাবেদ জাতি হিসেবে বাঙ্গালীর রয়েছে গৌরবময় অতীত। সহস্র বছরের সোনালী অতীতকে নির্ভর করে আমাদের অগ্রসব হতে হবে। বাঙালীর এই সহস্র বছরের গৌরবের সাথে আমাদের অঞ্চল চাঁদপুর অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে।

এদেশে যেসব বিদেশী পর্যটক আসেন তাদের বেশিরভাগ ব্যবসায়ের কাজে আসেন। তারা জানেন, এদেশের প্রতিবর্গ কিলোমিটার এ এক হাজার মানুষের বাস। এখানে কোন প্রাইভেসি নেই, সান্ধ্যজীবন নেই, মানবাধিকার নেই, আইনশৃঙ্খলা শৃঙ্খলাবদ্ধ। এখানকার মৌলবাদীরাও এসব প্রমাণ করতে যথেষ্ট সক্রিয়। আমাদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে তারা ততটা আগ্রহী নন। আমাদের ইতিহ্যাস ঐতিহ্য নিয়ে ওরা কোন খোঁজ খবর করেনা। শুধু সস্তা শ্রমের বাজার খোঁজেন। এই সব পর্যটকদের পুর্বপুরুষরা যখন যুদ্ধে হানা হানিতে মত্ত ছিলেন, ক্ষুধা দারিদ্র যখন তাদের নিত্য সাথী ছিলো আমাদের। নিজেদের প্রয়োজন আমাদের অতীত দিনের সোনালী সময়ের কথা তুলে ধরতে হবে। বলতে হবে, সুদুর অতীতে ইউরোপীয়ারা যখন অসভ্য বর্বর ছিলো তখন আমাদের

পূর্বপুরুষরা তখন ছিলো সমৃদ্ধ এক জগতের বাসিন্দা। পর্যটকদের মাধ্যমে বিশ্ববাসী যদি জানতে পারতেন, এদেশে ৫৫টি নৃগোষ্ঠী বসবাস করছেন, এদেশ রয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌভ্রমণযোগ্য অববাহিকা, সবচেয়ে সহনশীল জনগণের দেশ, পৃথিবীর বৃহত্তম ও জৈববৈচিত্রাসমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ জঙ্গালের দেশ, তিনরকম পৃথক বনভূমির দেশ, প্রাকৃতিক সৈকতের দেশ তাহলে আমাদের এমন দৈন্যদশা হতো না। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নির্দশন এখনও যা আছে তা অনন্য। সময়কালের হিসেবে ইউরোপীয়রা সে সময় প্রায় গুহাবাসী। যখন আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছিলো সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী নগরবাসী। সভ্যতা সংস্কৃতি ইউরোপে রপ্তানী হয়েছে এদেশ থেকেই, মসলিন, হাতির দাঁতের দ্রব্য সামগ্রী আর কাঠের আসবাবপত্রের সাথে। মেঘনা ডাকাতিয়া ধনাগোদা বিধৌত এক সমৃদ্ধ জনপদ চাঁদপুর , সমগ্র বাংলাদেশের মতোই অবহেলিত, অনাদারিত। চাঁদপুর শহরে পশ্চিম প্রান্ত সীমায় যখন সূর্য ডোবে তখন সাহসী জেলেরা ভয়াল মেঘনায় ডিঙ্গি ভাসায় সমৃদ্ধ জীবনের রসদের জন্যে।

ভুল তথ্যের গ্রহের ফেরে বাংলাদেশীরা দরিদ্রজাতি হিসেবে পরিচিত। আমাদের যাচাই করে নেয়া দরকার এর কতখানি সত্য আর কতটা বানানো। নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা নিজেদেরই ফেরি করতে হবে। তা না হলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা দায়ী থাকবো। ইলিশ মাছের অকালের মতো আমাদের অজ্ঞতা আমাদের গিলে খাবে। অসীম সাহসী জেলেদের মতো আমাদের।

অন্ধকার বিবর থেকে অতীতের উজ্জ্বল দীপশিখা সন্ধান করে আনতে হবে শেষ করার আগে কিছু কথা চাঁদপুর জেলার অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা কালে লেখকের মনে হয়েছে লোকালয়টির কিছু অংশ খুব বেশি প্রাচীন নয়, তবে এর অধিবাসীদের প্রাচীনত্ব স্থানের চেয়ে কয়েক গুন বেশি প্রাচীন। বঙ্গোপসাগর ক্রমশঃ দক্ষিণে সরে যাওয়ায় এবং মেঘনা, পদ্মা ও এই নদীসমুহের শাখা নদীসমুহ তাদের গতিপথ পরিবর্তন করার কারণে জনবসতি উত্তরপুর্ব দিক থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। চাঁদপুর জনপদে ইসলামের আর্বিভাব প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন। এ কথা প্রমানিত সত্য ''হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে'' গানটি ভুল। যিনি রচনা করেছেনে তিনি যেমন ইতিহাস বিমুখ তেমনি মুসলিম বিদ্বেষী অন্ততঃ লেখক তাই মনে করেন। লেখকের আরো মনে হয়েছে ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত থাকার একটি সহজসাধ্য উপায় পুরাকীর্তি সংরক্ষণ।

ইতিহাস ঐতিহ্য জ্ঞান নাগরিকদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে স্বজাত্যবোধ, সতন্ত্রবোধ ও দেশপ্রেম। আর এই পরিচিতি ও সচেতনতাবোধ সৃষ্টি জাতীয় জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। দেশের প্রত্নসম্পদ ও এর

পশ্চাত্যের তথ্য সমূহ একটি জাতি ও জনপদকে দিতে পারে বিশিষ্টতা। নানা ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে চাঁদপুর জনপদ অতিক্রম করেছে তার হাজার বছরের ইতিহাস, সোনালী অতীত। বিশেষ করে বাংলার জাকজমকপূর্ণ মুসলিম শাসনের প্রায় ছয়শত বছর চাঁদপুর অঞ্চলে ছিলো অসংখ্য তহশীল কাছারী, রাষ্ট্রীয় অর্থে নির্মিত হয়ে ছিলো অসংখ্য মসজিদ।

আজো চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে এসব মসজিদের দেখা পাওয়া যায়। চাঁদপুর জেলার প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে সমৃদ্ধ অতীত। লেখক ব্যাক্তি পর্যায়ে সীমিত সামর্থে চেষ্টা করেছেন এই সোনালী অতীতের সহজ বর্ণনা তুলে ধরার জন্যে। প্রাপ্ত ইতিহাসের প্রতিসৎ থেকেই লেখাটি রচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। যদুর সম্ভব ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। মনের ঐকান্তিক ইচ্ছে থেকেই নিজ জেলার অতীত জানার জন্যে লেখকের প্রয়াত পিতা, পিতৃব্য, বন্ধু বান্ধব, সন্তান, স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন তাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করছেন। রচনাটির জন্যে তিনি তাদের কাজে কৃতজ্ঞ। লেখক আশা করেন ইতিহাস মনস্ক বিদগ্ধজন এ ব্যাপারে সজাগ হবেন।

লোকগাঁথা জনশ্রুতি, যা আজো আকঁড়ে আছেন জেলার অনেক প্রাচীণ ব্যাক্তি অত্যন্ত সংগোপনে লোক চক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে অনেক চিত্র, তা থেকে ইতিহাস বের করে আনতে হবে খুবই বিচক্ষণতার সাথে। ইতিহাস বইগুলোর সাথে জনশ্রুতিকে মেধা ও জ্ঞান দিয়ে যাচাই করলে বের হয়ে আসবে চমকপ্রদ হৃদয়গ্রাহী কাহিনী যা সত্যিকার অর্থেই ঐতিহ্য লালিত। মাটির ওপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্মারক চিহ্ন গুলো আগামী প্রজন্মের প্রয়োজনে এখনই সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ইট সুরকির তৈরী এই স্থাপনা গুলোর মূল্য শান্তিকালীন সময়ে বোঝা না গেলেও যুদ্ধ বিগ্রহ ও জাতীয় বিপর্যয় কালে, স্থাপনা সমূহ কথা কইতে শুরু করে।

ইট সুরকির স্থাপনা গুলো হয়ে দাড়ায় প্রেরণার উৎস। সোনালী অতীত বর্তমানের জন্যে শক্তি সাহস জোগায়, ভবিষ্যৎ এর জন্যে হয়ে ওঠে দিক নির্দেশনার প্রতীক। চাঁদপুর জেলার সমৃদ্ধ জনপদের সেই সব সোনালী অতীত বর্তমান প্রজন্মের জন্যে অবশ্যই প্রেরনার উৎস হয়ে ওঠবে, আর তখনই হাজার বছরের সোনালী অতীত চাঁদপুর নামের জনপদের ললাটে গৌরবের চিহ্ন হয়ে কথা বলবে। লেখক তার আজন্ম লালিত বাসনা নিয়ে নিজের জেলার অতীতকে সন্ধান করার জন্যে এ জেলার ১৩৮৭ টি গ্রামের প্রায় সবগুলোতে গত একদশক ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। চেষ্টা করেছেন ধুসর হয়ে যাওয়া ছাইচাপা স্তুপ থেকে ইতিহাসের স্বর্ণখন্ড বের করে আনতে। লেখকের এই প্রয়াস আগামীতে চাঁদপুর জেলার ব্রিটিশ যুগের তথ্য তুলে ধরার আখাঙ্কা নিয়ে, এ লেখাটি এখানেই সমাপ্ত ।

ইতিহাসে চাঁদপুর
১ম পর্ব
সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি ঃ

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

জন্ম তারিখ ঃ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫২
পিতাঃ মরহুম শামছুল আমিন
মাতাঃ মরহুমা হাসমতউন নেছা
গ্রামঃ অলিপুর, পোঃ অলিপুর
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানঃ
'অঙ্গনা' মাদ্রাসা রোড
বিষ্ণুদী, চাঁদপুর।

চাঁদপুরের যে সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে লেখক সংশ্লিষ্ট

Asstt. Engineer, DPHE ,Chandpur
President IDEB, Chandpur
Secretary Rotary Club Chandpur 2003-04
Member - Secretary Freedom Fighter Council Chandpur
Member- Secretary Bangladesh Muktizuddah Sangshad Chandpur Unit Command
Member- Secretary Bangladesh Human Right Bureau Chandpur Unit
Life Member of Bangladesh Red Ceressent Society
Life Member Diabetic Association Chandpur
Vice President Bisnadi Senior Madrasha Chandpur
Adviser, Anayan Drama Group
Adviser Hajigonj Samity, Chandpur